স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺ জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের

স্মরণার্থে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বহু প্রেম ও

ভক্তির সহিত উৎসর্গীকৃত

হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জোছনা আলোকে, গাহিছে পুলকে,
কে এ নারী ব'সে নীরে ?

সন্ধ্যা আগতপ্রায়; ঝিক্‌মিকে বেলামাত্র আছে; এমন সময় একখানি খেয়া নৌকা গঙ্গার পশ্চিম পার হইতে আসিয়া পূর্ব্ব পারে লাগিল। যে স্থানটীতে লাগিল, তাহা পূর্ব্বে—যে সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতেছে—সেই সময়ে অপর নামে খ্যাত ছিল; এক্ষণে "চাকদা" বলিয়া পরিচিত। নৌকাখানি হইতে একে একে সকল লোক নামিয়া যাইলে, ইহা রাত্রের জন্য তীরে টানিয়া তুলিয়া দৃঢ়বদ্ধ করা হইল। দাঁড়ি তিনজন চলিয়া গেল, কেবলমাত্র যে মাঝির কাজ করিতেছিল, সে হালের নিকট উচ্চস্থানে বসিয়া উচ্চ-তানে গান ধরিল। মিষ্ট মনোহর স্বরলহরী, বায়ু-হিল্লোলে দিগন্তব্যাপী হইয়া গঙ্গা-বক্ষে লীন হইল—অনন্ত শব্দ-ব্রহ্ম, অনন্ত আকাশে মিশিতে লাগিল। এই সুললিত বীণা-ঝঙ্কারবৎ গীত স্পষ্টতই রমণীকণ্ঠনিঃসৃত। আসুন পাঠক, আপনাকে একটী কমনীয় দৃশ্য দেখাই; গঙ্গাতীর, ধীর সমীরণ বহিতেছে, বিশদ চন্দ্রালোক চতুর্দ্দিক বিভাসিত

করিতেছে, অতুলনীয়া গৌরাঙ্গী ষোড়শীবালা মনপ্রাণ একতান করিয়া কাতরপ্রাণে ভগবানের স্তোত্র গাহিতেছে; উন্মত্ত [illegible] বাহ্যজ্ঞান নাই; গণ্ডদ্বয় চক্ষের জলে প্লাবিত, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, ভক্তিস্রোত হৃদয় আলোড়িত করিয়া কণ্ঠে প্রকাশিত! এই রমণীরত্নই খেয়া নৌকার পাটনী এবং ইহারই কণ্ঠস্বর চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিতেছিল। রমণী ভক্তিপ্রেমের আবেগে এতদূর বিভোর হইয়াছেন যে, সেই সময় একখানি তিন-কামরা ভাউলিয়া ও তৎসঙ্গে দুই খানি বড় পান্‌সি সেই স্থানে আসিয়া নঙ্গর করিলেও তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না; আপন ভাবে এতই মাতোয়ারা যে ভাউলিয়ার মাঝি পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেও কিন্তু কোন হুঁস নাই, মাঝিও ডাকিতে ছাড়িল না, সুতরাং চৈতন্য হইল; তখন সলজ্জ ও সচকিত ভাবে উত্তর করিলেন;—

"কি বলিতেছ?"

"এ জায়গার নাম কি?"

"চাক্‌দা।"

"এখান হইতে গ্রাম কতদূর?"

"নিকটেই।"

"ডাকাত, বোম্বেটের কোন ভয় আছে?"

"কৈ, অনেক দিন ত কিছু শুনি নাই, কিন্তু একেবারে যে নির্ভয় তাও বলিতে পারি না।"

"তা, তুমি কে?"

"পাটনি।"

"মেয়ে মানুষ মাঝির কাজ করে বড় আশ্চর্য্য!"

"কেন, কখন কি মেয়ে পাটনি দেখনি?"

"দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না।"

"তবে নূতন জিনিষ দেখিয়া লও।"

"এত অল্প বয়েস, ধন্য তোমার সাহস ও ক্ষমতা।"

"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?"

"ঢাকা হইতে।"

"কবে ঢাকা ছাড়িয়াছ?"

"আজ দশ দিন।"

"ও কিও" বলিয়া রমণী হঠাৎ অঙ্গুলি দিয়া গঙ্গাবক্ষে এক স্থান নির্দ্দেশ করিলেন; অপর মাঝি, মাল্লা, চাকর, দরওয়ান—যাহারা কথোপকথন শুনিতেছিল, তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "উহারা নিশ্চয়ই বোম্বেটিয়া।"

পূর্ণচন্দ্রালোক, দিনের ন্যায় সকলই প্রকাশমান, গঙ্গা-জলে দৃষ্ট হইল ছয়খানি লোকপূর্ণ নৌকা বেগে ভাউলিয়ার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। একটা বিষম গোল পড়িয়া গেল। গালপাট্টাধারী ভোজপুরীয়া বীরগণ,—যাহারা চাকুরাণীদের নিকট বরাবরই আপন আপন বল, কৌশল ও বীরত্বের ব্যাখ্যা ছন্দেবন্দে করিয়া আসিতেছিল, তাহারা আস্ফালন করিতে করিতে তীরে লম্ফ দিয়া উঠিয়া কে কোথায় যে অদৃশ্য হইল, তাহার ঠিকানা নাই। মাঝিমাল্লারাও সেই পথের পথিক হইল; সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে ভাউলিয়া ও পান্সি দুই

খানি লোকশূন্য হইল। কেহ কোথাও নাই, কেবল ভাউ-লিয়ার কাম্‌রার ভিতরে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং জনেক বৃদ্ধ ভদ্রলোক শশব্যস্তে ভাউলিয়ার ছাদের উপর উঠিয়া বোম্বেটিয়াদের নৌকাগুলি দেখিয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্‌, কি করিলে! ধনেপ্রাণে মজিলাম! কে আর রক্ষা করিবে? কোথায় বিপদভঞ্জন মধুসূদন হরি, বাবা! একবার মুখ তুলিয়া তাকাও! অধম, পাতকী সন্তানদের রক্ষা কর"। বৃদ্ধের ক্রন্দনে পাটনির মন টলিল; সে সত্বর আপন নৌকা হইতে নামিয়া ভাউলিয়ায় গিয়া উঠিল এবং বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, ভয় নাই, উঠ; হরি তোমার কথা শুনিয়াছেন এবং তোমারে কৃপা করিয়াছেন"। বৃদ্ধ উঠিয়া রমণীর মুখের দিকে তাকাইলেন এবং সেই কমনীয়া মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। সেই প্রজ্বলিত চক্ষুর্দ্বয়, ধীর গম্ভীর ভাব, উদ্দীপ্তা সিংহীর ন্যায় উত্তেজিতা বালাকে দেখিলে স্বতঃই সাহস আইসে; সুতরাং বৃদ্ধ করযোড় করিয়া বিনীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মা! তুমি সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী, মা! অভয়ে, তোমাকে দেখিয়া আমার ভয় তিরোহিত হইয়াছে, মা! রক্ষা কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাহার রমণী, কাহার ঘরণী,
নাচি নাচি ফিরে সমরে ?

পাটনি বৃদ্ধকে সাহস দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সড়কি কিম্বা বল্লম আছে কি ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "যথেষ্ট পরিমাণে আছে, পূর্ব্বদেশীয় নৌকা, মাঝি মাল্লারা ইহা ব্যতীত প্রায় পথ চলে না।"

পাটনি বলিল, "ভালই হইয়াছে ; আপনি কতকগুলি সড়কি বল্লম আমার কাছে ভাউলিয়ার ছাদে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কামরায় অপেক্ষা করুন, আর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের কান্না নিবারণ করুন, অন্য যাহা কিছু করিতে হইবে আমি স্বয়ং তাহা করিব।"

বৃদ্ধ, পাটনির কথামত সমস্ত কার্য্য করিল এবং কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে যজ্ঞোপবীত হস্তে জড়াইয়া (কারণ ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ) ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীও ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগি-লেন এবং কামরাস্থিত অপরাপর বালক-বালিকারা ভয়ে আকুল হইয়া সকলে চুপ করিয়া রহিল। ক্রমে বোম্বেটিয়া-দের নৌকা শনৈঃশনৈঃ ভাউলিয়ার নিকটবর্ত্তী হইল, পাটনি দুই হস্তে দুইখানি সড়কি লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, জ্যোৎস্নালোকে তাহার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া ডাকা-ইতেরা নৌকা বাহা বন্ধ করিল, এবং আপনারা কি পরামর্শ

করিয়া দলপতিকে দাঁড়াইয়া উঠিতে অনুরোধ করিল। বঙ্গদেশের ডাকাইতেরা শক্তিমূর্ত্তিকে বিশেষ ভক্তি করে, সুতরাং সর্দ্দার ঈদৃশ লাবণ্যবতী শস্ত্রধারিণী, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী রমণীকে দেখিয়া যুক্তকরে গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিল, এবং বলিল, "মাগো! আমাদের অনুমতি দিন, কার্য্য সাধন করি।" বালা উত্তর করিল, "আমি এ ভাউলিয়া রক্ষা করিতেছি, ভাল চাও ত চলিয়া যাও, কোন ব্যাঘাত করিব না, নচেৎ উচিত শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইবনা।" ডাকাইতেরা পুনরায় কি পরামর্শ করিতে লাগিল এবং সর্দ্দার পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া বলিল, "মাগো! তোমারই কৃপায় আমরা কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তা তুমি নিষেধ করিলে, আমরা কেমন করিয়া অগ্রসর হই; দেখ মা, আজ দশ দিন ইহাদের পিছন লইয়াছি, বরাবর ঢাকা হইতে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছি, এত দিন সুযোগ পাই নাই, তাই কার্য্য সাধন করিতে পারি নাই. আজ সমস্ত সুবিধা আছে, তা তুমি হুকুম দিলেই তৎপর হইয়া কার্য্য করি, আমাদের নৈরাশ করিও না, দোহাই মা তোমার।"

রমনী দক্ষিণ হস্তে সড়কি উত্তোলন করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার বার বার এক কথা কহিবার স্পৃহা নাই, ভাল চাও ত চলিয়া যাও, নচেৎ যুদ্ধ কর, আমাকে বলে নিবারণ না করিলে, তোমাদের অসৎ প্রবৃত্তি সাধনের উপায়ান্তর নাই।" সর্দ্দার উত্তর করিল "আমাদের ক্ষমা করিবেন, একবার মায়ে-সন্তানে যুদ্ধ ব্যতীত বুঝি আমাদের অন্য উপায় আর নাই।" এই

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই, পাটনি দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল "তোমাদের প্রথম বার ক্ষমা করিব, প্রাণে মারিব না, কিন্তু আঘাত করিব। ছয়খানি নৌকার মাঝিরা সাবধান হও"। যেমন বলা, সেইমত করা। মুহূর্ত্তের মধ্যে ছয় গাছি সড়কি ছয়জন মাঝির দক্ষিণ হস্তে সবেগে পড়িল; আঘাতের বেগে দুইজন জলে পড়িয়া গেল, একজন নৌকার খোলে পড়িল ও বাকি কয়জন সড়কি খুলিতে ব্যতিব্যস্ত হইল। দাঁড়িরা মাঝিদের সহায়তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল, সুতরাং নৌকাগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া স্রোতে ছুটিয়া চলিল, আবার যোটপাট করিয়া আসিতে ডাকাইত-দের কিছুকাল বিলম্ব হইল। এবার রমণী বলিয়া উঠিলেন, "আমার কোন দায় দোষ নাই, তোমরা আমার নিষেধ বাক্য শুনিলে না, দয়া করিয়া প্রথমবার প্রাণেমারিলাম না, তাহা-তেও চৈতন্য হইল না, সুতরাং এইবার আপন আপন দুষ্কৃ-তির ফল ভোগ কর।" কথা শেষ হইতে না হইতেই নৌকা-গুলির উপর বল্লম ও শড়কির বৃষ্টি হইতে লাগিল। কাহার হস্তে, কাহার পদে, কাহার মস্তকে, কাহার বক্ষে আঘাত লাগিতে লাগিল, অস্ত্রবৃষ্টির বিরাম নাই, ডাকাইতেরা হতা-হত ও বিধিমতে বিড়ম্বিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল, কাহার সাধ্য এ অসুরনাশিনীর নিকট তিষ্ঠায়! কি ক্ষিপ্রহস্ততা, কেমন বাহুবল, কীদৃশ অব্যর্থ সন্ধান, কি প্রকার চাঞ্চল্য; ঠিক যেন 'কার রমণী নাচে এ রণে গো," "অসুরনাশিনী প্রলয়কারিণী।" ডাকাইতেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইল, আর ফিরিল না। রণ-বিজয়িনী পুনরায় গান

ধরিলেন। গান শুনিয়া বৃদ্ধ নৌকার ছাদের উপর আসিলেন এবং ডাকাইতদের নৌকাগুলি দেখিতে না পাইয়া বিনীত-ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাগো, তোমার জন্য আজ ধনে-প্রাণে বাঁচিলাম, কি দিয়া এ ধার শোধ করিব"। বালা উত্তর করিলেন, "আমি এমন কিছুই করি নাই যে, আপনাকে আমার নিকট ঋণী হইয়া থাকিতে হইবে।"

"সে কি মা, আমি ভাউলিয়ার ভিতর হইতে খড়খড়ি খুলিয়া সমস্ত দেখিয়াছি, ডাকাইতদের উপর অস্ত্রবৃষ্টি হইয়াছিল, আর একটীও বল্লম কি সড়কি নিষ্ফল হয় নাই, ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার শিক্ষা!! তা মা, একবার ভাউলিয়ার ভিতর চল, আমার স্ত্রী তোমাকে দেখিতে চাহি-তেছেন, ডাকাইতদের পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবার কি সম্ভা-বনা আছে?"

"আমার বোধ হয় না, তাহারা এ মুখো আর হইবে না; যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছে, তবে চলুন কামরার ভিতরে যাই।"

দুইজনে কামরার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের স্ত্রী রমণীকে প্রণাম করিয়া একখানি বারাণসী সাটী এবং আপ-নার দুই হস্ত হইতে দুই গাছি বহুমূল্য বালা খুলিয়া পাট-নিকে পরাইতে আসিলেন। যুবতী শিহরিয়া উঠিয়া বলি-লেন, "মা কি কর, আমি আপনাদের বিপদগ্রস্ত দেখিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি মাত্র, পুরস্কার পাইবার ইচ্ছায় কিছু করি নাই।" রমণীর চক্ষু ছল ছলিয়া আসিল এবং এমন বিরসবদনে একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন যে, বৃদ্ধ ও তাঁহার স্ত্রী আর উপহারের কথা উল্লেখ করিতে সাহসী হইলেন না; বরং

দুইজনে লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বৃদ্ধের স্ত্রী পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, "মা! তোমাকে উপহার দিতে যাই নাই, শক্তির পূজা করিতেই গিয়াছিলাম।" পাটনি উত্তর করিলেন, "মা! আমাকে অত উচ্চ স্থান দেওয়া তোমাদের উচিত নহে। আমি কোন অমানুষিক ক্রিয়া করি নাই, ক্ষিপ্রহস্ততা ও লক্ষ্যভেদের সামান্য পরিচয় দিয়াছি মাত্র, তাহাও আমার এ বিষয়ের গুরু জয়া সর্দ্দারের শিক্ষার ফল; কোনও পুরুষ এ প্রকার করিলে ডাকাইতেরা কখনই হটিত না; কেবল আমাকে স্ত্রীলোক—শক্তিরূপিণী দেখিয়া, শিক্ষার দোষে বা গুণে, যাহাই বলুন, পলায়ন করিয়াছে। সে যাহা হউক, রাত্রি এখন অধিক হইয়াছে, আমার বাটী যাওয়া চাই, আমার অভিভাবক আমার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন, আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না যাইব, তিনি রাত্রের আহার পর্য্যন্ত পাইবেন না; কারণ তিনি খঞ্জ, গমনাগমন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।"

পাটনির যাইবার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ এবং তাঁহার স্ত্রী সিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহাদের ভয়, পাছে রমণীকে যাইতে দেখিয়া বোম্বেটিয়ারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসে। সে ভয়ের কারণ কিন্তু আদৌ ছিল না, ডাকাইত দল সত্য সত্যই চলিয়া গিয়াছে।

তাঁহাদের কামরার ভিতরে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মহাবীর দরওয়ানেরা, মাঝি, মাল্লা, চাকর, চাকরাণী প্রভৃতি যাহারা নিকটেই এখানে ওখানে লুক্কায়িত ছিল এবং যাহারা ডাকাইতদের পলায়ন স্বচক্ষে

দেখিয়াছিল, তাহারা একে একে সমস্ত দিক্ নিরাপদ দেখিয়া, ভাউলিয়া ও পান্‌সিদ্বয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার চেঁচাচেঁচি সোরগোল হইতে লাগিল, প্রত্যেকেই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে তাঁহার মতন বীরপুরুষ জগতে বিরল এবং তিনি না থাকিলে ডাকাইতেরা কখনই পলায়ন করিত না এবং সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন না করিয়া চলিয়া যাইত না। একজন গালপাট্টাবাঁধা ভোজপুরিয়া, যিনি এতক্ষণ কদলীফল লোলুপ, লাঙ্গূলধারী জন্তু বিশেষের ন্যায় নিকটস্থ বৃক্ষোপরি নিভৃতে বাস করিতেছিলেন, তিনি মহা আস্ফালন ও গলাবাজী করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভেইয়া, হাম্ যে আওয়াজ কিয়া, ও শুন্‌কে ডাকুলোক ভাগা, এক আউরৎ দেখ্‌কে উস্‌লোকোন্‌কো ভাগ না বড় তাজ্জব্‌কি বাত, হামারা আওয়াজ কোশভর যাতা হ্যায়্।" এই প্রকার প্রচুর বাক্যালাপ হইতে লাগিল। পাটনি কাম্‌রার ভিতর হইতে এই গোলযোগ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আমায় বিদায় দিন, আপনার লোকজন সমস্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে আর ভয়ের কোন কারণ নাই, ভয় থাকিলে আমি কখনই যাইতাম না।" উঁহাকে যাইতে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বৃদ্ধের স্ত্রীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, তিনি পাটনির দুইটী হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন্, মা! তোমার এ উপকার যতদিন বাঁচিব, ততদিন ভুলিতে পারিব না; তুমি আমাদের স্ত্রীজাতির গৌরব, তোমার মঙ্গল হউক।" পাটনিও নিরশ্রু নহেন, তিনি ধীরে ধীরে কামরা হইতে বাহির হইলেন এবং বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া

যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ বলিয়া উঠি-লেন, "মা! যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমি তোমার সঙ্গে যাইব, তোমার অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে এবং তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানতে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে।" পাটনি উত্তর করিলেন, "আপনার এ রাত্রে এত কষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না, তবে যদি নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে ত চলুন।" বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে কি বলিয়া আসিলেন এবং চাকর, দরওয়ান, মাঝি, মাল্লা প্রভৃতিকে সতর্কে থাকিতে বলিয়া পাটনির সঙ্গে তীরে গিয়া উঠিলেন এবং উভয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘুচাও কামনা, পুরাও বাসনা,
—কহ পূরব কথা।

অল্পক্ষণ চলার পর একটী গ্রামে গিয়া উভয়ে পৌঁছি-লেন। গ্রামটী সামান্য পল্লীগ্রামমাত্র; কিন্তু অনেকগুলি ভদ্র-লোকের বাস, ইতরলোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। পাকা বাটী প্রায়ই নাই, সবই চালাঘর, কেবলমাত্র দুইটী পাকা দেবমন্দির ছিল, এখানে জনকয়েক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাস ছিল; তাঁহারা নিয়মিত অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং জনেক প্রকৃত শাস্ত্রদর্শী বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত

ছিলেন, ফলতঃ গ্রামটি সৎভদ্র পল্লী এবং গঙ্গার ধারে স্থিত বলিয়া ইহার কিছু গৌরব ছিল।

গ্রাম নিস্তব্ধ। পক্ষিবিশেষের রব, সময়ে সময়ে শৃগাল ও গ্রাম্যকুক্কুরের কোলাহল, ক্বচিৎ বা গৃহাভ্যন্তরে মাতৃ-ক্রোড়স্থিত শিশুসন্তানের রোদন শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই শুনা যাইতেছে না। অমৃতময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সকল জীবই শায়িত। হঠাৎ গ্রাম্য চৌকিদার ডাক দিল এবং মনুষ্যের পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধও পাটনির দিকে আসিল; পাটনিকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "কি মা, এত রাত্রে কোথা থেকে আসা হচ্চে, সব মঙ্গল ত?"

"হ্যাঁ খুড়ো, সব মঙ্গল; খেয়া বন্ধ করে এঁয়ার একটু বিপদ ঘটার দরুন আসিতে এত রাত্র হয়েছে।"

"বিপদ কি মা?" চৌকিদার জিজ্ঞাসা করিল।

বৃদ্ধ তখন উত্তর করিলেন, "বাপু, আমরা ঢাকা হইতে ভাউলিয়ায় আসিতেছিলাম, তোমাদের ঘাটে রাত্রে নঙ্গর করিয়া থাকি, এমন সময় বোম্বেটেরা আসিয়া আমাদের আক্রমণ করে; ধনে প্রাণে মজিতাম, তা মা আমার কৃপা করে রক্ষা করিয়াছেন।"

"ওগো মশাই, মার গুণের কথা আর কি বল্‌বো! গাঁ শুদ্ধ্ লোক ওঁর গুণে বশ, তাই শিরোমণি মশাই ওঁকে শ্রীর শ্রী বলেন, আর দেশশুদ্ধ্ লোক তাহাতে সায় দেয়। মার কাছে দাঁড়ায়—এমন কোন্ বেটা আছে? বুড়ো জয়া সর্দ্দার একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়, সে পূর্ব্বে একজন নাম-জাদা ডাকাত ছিল; সে বলে, মার মতন তার একটী সাক্-

রেদও ওতরায় নাই। তা মা ব্যাটাদের জব্দ করে দিয়েছ ত?” বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, “খুব জব্দ হইয়াছে, প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইয়াছে।”

“বেশ বেশ, জয় মা শ্রী, জয় মা কালী” বলিতে বলিতে চৌকিদার অপরদিকে চলিয়া গেল। ইহাঁরা দুইজন খানিক দূর গিয়া একটী ঘরের নিকট দাঁড়াইলেন, কন্যা দ্বারে আঘাত করিয়া “দাদা, দাদা” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; একজন পুরুষ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, এবং বলিল, “বোন্, এত রাত কেন? আমার ভাবনায় ঘুম হয়নি, সব মঙ্গল ত?

কন্যা উত্তর করিল, “হ্যাঁ দাদা, সব মঙ্গল; ব্যাপার পরে বলিব। এখন তোমার খাওয়া হয়নি, আমি পাক করিগে, গোরুবাছুরগুলাও জাব পায়নি, হায় হায়”! যে দ্বার খুলিয়াছে সে বলিল, “না, দিদি এত রাত্রে আর খাব না; পেট ভরে মুড়ি মুড়কি খাইয়াছি, তা গোরুগুলাকে জাব দেওয়া দরকার, তা তোমার সঙ্গে ইনি কে?” কন্যা বলিয়া উঠিল, “দাদা ঘরে চল, ঘরে গিয়া ইঁহার সঙ্গে আলাপ কর, আমি গোরুগুলাকে খাইতে দিয়া ঝাঁট পাট সারিয়া আসিতেছি।” এই কথাগুলি বলিয়া রমণী দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধও “দাদার” সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটি মৃত্তিকা-প্রাচীরে চতুর্দ্দিক ঘেরা, ভিতরে অনেক জায়গা, স্থান বৃথা পড়িয়া নাই, নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছে পরিপূর্ণ, গোয়াল ও রন্ধনের চালা ছাড়া, দুইখানি বড় বড় শয়নের ঘর ও দাওয়া; শয়নঘরের বহির্দ্দিকের দেয়ালে গাছ, পক্ষী, মানুষ নানা রঙে আঁকা, ঘরের সম্মুখে

একটী বড় পাকা তুলসীমঞ্চ। ফলতঃ ঘর দ্বার খুব যত্নে রক্ষিত এবং এমন পরিষ্কার যে ছুঁচটি পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ দেখিলেন যে, "দাদা" খঞ্জ; বহুকষ্টে একটি লাঠি ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে সক্ষম। খঞ্জ আপন ঘরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া বসাইল এবং তামাকু সাজিয়া পান করিতে আহ্বান করিল। বৃদ্ধ হস্তে হুঁকা লইয়া বলিলেন "বাপু, এ কন্যাটী কে এবং তুমিই বা কে? তোমাদের সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার জানিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর"। খঞ্জ উত্তর করিল, "আমাদের সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনিই বা কে এবং আমার ভগ্নীর আসিতেই বা এত বিলম্ব হইল কেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "বাপু, আমি একজন ব্রাহ্মণ, তোমাদের গ্রামের নিকটস্থ এদেশেই বাস। বহুকাল হইতে ঢাকার নবাব সরকারে এক উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত আছি, অনেক কাল বাটী যাই নাই; সম্প্রতি কন্যার বিবাহ ও পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে স্ত্রী লইয়া দেশে যাইতেছি। আমি দোজবরে, অধিক বয়সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলাম, তাই আমার সন্তান-সন্ততির এত কম বয়েস, সে যাহা হউক, ঢাকা হইতে অনেক দিনের সঞ্চিত, কিছু অর্থাদি লইয়া যাইতেছি; তাই বোম্বেটিয়ারা সন্ধান পাইয়া আমার ভাউলিয়ার পাছে পাছে বরাবর ঢাকা হইতে আসিতেছিল, এতদিন কোন সুযোগ পায় নাই; বরাবর গঞ্জে ও বাজারে লাগাইয়া আসিতেছিলাম,

অদ্য রাত্রে তোমাদের ঘাটে নঙ্গর করি, সঙ্গে দরওয়ান চাকর বাকর মাঝি মাল্লা অনেক আছে, কিন্তু েটারা এমন কাপুরুষ, যেমন বোম্বেটিয়ারা আমাদের অসহায় পাইয়া আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল, অমনি তাহারা কে কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহার ঠিকানা নাই, তখন নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলাম, কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া হা হুতাশ করিতেছি, এমন সময়ে তোমার ভগ্নী আমাদের ভাউলিয়ায় আসিলেন এবং আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন; তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ও বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ শীতল হইল, তাহার পরে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া অবাক্, অজ্ঞান হইলাম, ঠিক যেন মা শক্তিমূর্ত্তি আমার প্রতি কৃপা করিয়া মানুষীরূপ ধারণ করিয়া আমার সহায় হইলেন। অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল; কি সাহস! লক্ষ্য ভেদ করিবার কেমন কৌশল! ডাকাইতেরা যথার্থই হতভম্বা হইয়া রণে ভঙ্গ দিল। অবশেষে পলায়ন করিল, আর ফিরিল না। আমরা নিরাপদ হইলাম. এখন এ তেজস্বিনী অতুলনীয়া সুন্দরী কে এবং তুমিই বা কে? তোমার সঙ্গে রক্তের কিম্বা বংশগত কোন সম্পর্ক আছে, এমন ত বোধ হয় না, তা বাপু সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিয়া আমায় সুখী কর, সব বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।”

খঞ্জ উত্তর করিল—‘মহাশয়ের অনুমান সত্য, ইনি আমার মায়ের পেটের কিম্বা কোন নিকট বা দূর সম্পর্কীয় ভগ্নী নহেন। ইনি আমার মনিবের কন্যা, কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি এবং মায়ের পেটের ভগ্নীর অপে-

ক্ষাও অধিক ভালবাসি ; আমার সংসারে কেহ নাই, ইনিই আমার সর্ব্বস্ব, আশীর্ব্বাদ করুন ইহাঁর বিবাহ দিয়া, ইহাঁকে সংসারী করিয়া, সুখে সচ্ছন্দে রাখিয়া আমি মরিতে পারি।” এই কথা বলিতে বলিতে খঞ্জের চক্ষে জল আসিল এবং এই সময়ে শ্রী ঝাঁটপাট শেষ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, খঞ্জ অমনি বলিয়া উঠিল, “দিদি রাত ঢের হইয়াছে ; সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রেও যথেষ্ট খাটুনি হইয়াছে এখন আপনার ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, আমি ইঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রাত কাটাইয়া দিব।”

শ্রী অগত্যা আপন ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন এবং অনতিকাল পরেই সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন! বৃদ্ধ ও খঞ্জের পূর্ব্বমত নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লহ পরিচয়
ওহে মহাশয়——মনসাধ পূরি।

বিশেষরূপে পরিচয় প্রদান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া খঞ্জ বলিল, “মহাশয়, আমি ভাল করিয়া সমস্ত বলিতে পারিব না, আমার মনিবের একখানি হস্তলিখিত খাতা আছে, তিনি দেশত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমায় সেখানি দিয়া যান, আপনি তাহা দেখুন, দেখিলে অনেক বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার দেশত্যাগের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে সব

আমি পরে বলিব। এই বলিয়া খঞ্জ (ইহার নাম গোপাল এবং এই নামেই এখন হইতে আমরা তাহাকে ডাকিব) একটি সিন্দুকের ভিতর হইতে কাপড় দিয়া যত্নে বাঁধা একখানি খাতা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিল, খাতা খানির উপরে লেখা "জীবনের গোটাকত জীবনের কথা"। বৃদ্ধ তাহা লইয়া চস্‌মা বাহির করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অদ্য আমার পিতৃদেবের স্বর্গলাভ হইল। পিতা ঠাকুর কোন ব্যাধি ভোগ না করিয়া সহসা এ ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যাইলেন, কিছুইত হইল না; সহজ মানুষ, কথা বার্ত্তা কহিয়া, ভগবানের নাম লইয়া চলিয়া গেলেন, এমন মৃত্যুত কখন দেখিনা। ভগবন! আমি যেন এই প্রকার করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারি। এ রকম মৃত্যু যাঁহার হয়, তিনি যে শমনকে জয় করিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পিতার অবর্ত্তমানে সবই ফাঁক ফাঁক বোধ হইতেছে—কিসের যেন অভাব, কি যেন পাইতেছি না, আশা যেন মিটিতেছে না, কে আমার মন প্রাণ শীতল করিবে? কি আশ্চর্য্য! মাতা নিকটে আসিলেই আমি সকল দুঃখ ভুলি; মাতৃপ্রেমের কি দুর্দ্দান্ত শক্তি; পিতৃবিয়োগজনিত প্রাণের জ্বালা মাতৃচরণ তলে ভুলিয়া যাই; যতক্ষণ গর্ভধারিণী নিকটে থাকেন, তত-ক্ষণ ক্লেশ তিরোহিত হইয়া পূর্ণ উল্লাস হয়, তিনি অন্তরালে যাইলেই পুনরায় ক্লেশ হয়। যদি মাতাপিতা প্রেমের বলে এ অঘটন ঘটাইতে পারেন, তবে জগৎপিতা জগন্মাতা মনুষ্যের জন্য কিনা করেন? যে দিকে তাকাও, প্রেমের

পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না—কিসে সন্তান সুখী থাকিবে ; এমন মাতাপিতাকেও আমরা ভুলিয়া থাকি ; দিনান্তেও স্মরণ করি না, হায় হায় আমাদের কি দশা হইবে ? পরমগুরু পিতামাতাকে প্রেমভক্তি করিয়া জগৎকর্ত্তাকে প্রেমভক্তি করিতে আমরা শিক্ষা করি। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের চরণ পাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দেখিতে দেখিতে ছয়মাস কাটিয়া গেল। মা জননী আমার দিন দিন যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন মুখে আমাদের বুঝান, সাহস দেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে কি হইতেছে কে বলিতে পারে ? মুখ যদি কোন পরিমাণে হৃদয়ের পরিচয় দেয়, তবে বেশ বলিতে পারি, মাতার অন্তর দিন রাত জ্বলিতেছে। মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। আবার সময়ে সময়ে মুখে একটা অদ্ভুত জ্যোতিঃ দেখিতে পাই ; তখন তাঁহাকে এ জগতের লোক বলিয়া বোধ হয় না। মুখের ঐ প্রকার ভাব দেখিলেই আমার আশঙ্কা হয়, মা বুঝি আমাদের ত্যাগ করিয়া পিতৃপদের অনুসরণোন্মুখী হইতেছেন। তাঁহার এখন পূজা আহ্নিকেই দিন কাটে, আহারটা কেবল নামে মাত্র আছে। রাত্রে কখন ঘুমান, বলিতে পারি না ; কিন্তু যখনই উঠি, দেখি মালা জপিতেছেন, আর কাহার সঙ্গে যেন নিতান্ত আস্তে আস্তে বাক্যালাপ করিতেছেন। কাহার সঙ্গে কথা কন ? কি জানি ভগবানই জানেন।

হে ঠাকুর ! আজ কি হইল, আজ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন ? পিতৃবিয়োগের পরবৎসর ঘুরিল না, আর মা

আমাদের ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। হায় হায় মা বাপ কি বস্তু, তা এখন জানিলাম। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা কেহ বুঝে না, এতদিন পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম, এখন নিরাশ্রয় হইলাম; না না জগৎপিতা হরি যে আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, কিসের ভয়? ভগবান মাতাপিতা-রূপে ঘরে ঘরে বিরাজ করেন, তাঁহাকে অপররূপেও দেখিতে পাই। কিন্তু জনকজননীরূপে তাঁহার মূর্ত্তি জ্বলন্ত। মাতৃ শ্রাদ্ধ চুকিয়া গেল। মাতার রক্ত মাংসের শরীর দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু শ্রদ্ধা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ডাকিলেই মানস চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাই; তাঁহাকে পাই, পিতা-কেও পাই। অশরীরি হইয়া তাঁহারা ও অপরাপর প্রিয় প্রাণের বস্তুরা সদা আমাদের নিকটে আছেন, সে চক্ষু থাকিলে আমরা সহজে তাঁহাদের দেখিতে পাই, নিকটে থাকাত উপলব্ধি করিই। আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অপর কেহ আর নাই, কষ্টের সময় চক্ষের জল মুছাইয়া দেয়, এমন ত কাহাকে দেখি না। আমার কি কপাল! কি ভাগ্য লইয়া আমি জগতে আসি-য়াছি! "আহা" বলে এমন আমার কেহ রহিল না! কত মহা-পাতক আমি জন্ম জন্মান্তরে করিয়াছি। আমার পিতামাতার জীবদ্দশায় অগ্রজ মহাশয়ের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। সে ধাক্কা তাঁহার খুব লাগে, লাগিবার ত খুব সম্ভব, এমন সরলা ধর্ম্ম-শীলা উচ্চদরের স্ত্রীলোক আমি কখন দেখি নাই, রূপে গুণে তিনি যথার্থই লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন; দাদার মুখে কিছু ফুটিত না; কিন্তু তিনি যে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা

আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম। স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি এমন অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহারও সঙ্গে প্রায় বাক্যালাপ করিতেন না। ইহার উপর আবার মাতাপিতৃ বিয়োগ হওয়াতে তিনি একবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। একদিন আমায় ডাকিয়া নিভৃতে বলিলেন—

"ভাই, তুমি ছাড়া আমার আর সংসারে কোন বন্ধনী নাই, অপর বন্ধন ত সব ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম তোমাকে অবলম্বন করিয়া কাল কাটাইব, যে কয় দিন জগদীশ্বর রাখেন, সেই কয়দিন তোমাকে বুকে করিয়া সমস্ত কষ্ট ভুলিব। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ; আমি গৃহী হই, বোধ হয় বিধাতার তাহা ইচ্ছা নহে, সে যাহা হউক, ভাই সদা সাবধানে থাকিবে, ভগবানের উপর পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করিবে, তিনি বই আমাদের বন্ধু আর কেহ নাই। স্বদেশে, বিদেশে—যথা তথায়—তিনি একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। তাঁহাকে মনে প্রাণে, প্রেমভক্তি করিবে, মনুষ্যে প্রেম করা বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা ভাসিয়া যায়, কিন্তু ভগবানের প্রেম চিরস্থায়ী; তাহা অনন্তকাল অটুট থাকে। ভাই! এ ভগ্ন বসতবাটী ছাড়া আমাদের অপর কোন সম্পত্তি নাই, পিতাঠাকুর মহাশয়ের যাহা ছিল, তাহাতে তাঁহার কর্ম্ম ছাড়া পর্য্যন্ত, এতদিন সংসার চলিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহা তাঁহাদেরই কর্ম্মে লাগিয়াছে; দুই-জনারই শ্রাদ্ধব্যয় সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহা-দের আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন বেগ পাইতে হয় নাই, তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, বহু অন্নদান করিয়া গিয়াছেন, সেই

পুণ্যে আমাদের অন্নকষ্ট কখনই হইবে না; বিশেষতঃ তুমি সুশিক্ষিত হইয়াছ, চেষ্টা করিলেই উপযুক্ত চাকরি পাইবে। এখন কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মপথে থাকিয়া উপায়ক্ষম হইয়া, সংসারী হইয়া, সুখেস্বচ্ছন্দে, তোমার দিন কাটুক। তোমার দ্বারাই আমাদের বংশ রক্ষা হইবে ও পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম সম্ভ্রম বজায় থাকিবে"।

এই কথাগুলি বলিয়া দাদা আমায় বুকের দিকে টানিয়া লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন, আমিও নিরশ্রু রহিলাম না, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কাঁদিতে লাগিলাম ও বলিয়া উঠিলাম "দাদা, আমি এখন অনাথা, আমায় এ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইও না, তুমি বই আমার আর কে আছে? আমি যে চারিদিক্ শূন্য দেখিতেছি, আমায় চরণে রাখিও, বল, আমায় ত্যাগ করিবে না।" এই বলিয়া আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম ও কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমায় সান্ত্বনা করিয়া বিকৃত, শোকসূচক, হৃদয়ভেদী স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"প্রাণের জীবন! ভাই! আর আমায় জড়াস্‌নে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শুনহ বচন
তেজিব ভবন—— করিব ফকিরি, দেশে দেশে ফিরি।

"যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। একদিন প্রাতে দাদা কোথায় চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না। কত অনুসন্ধান করিলাম, সকলই বিফল হইল। তাঁহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। দিন কয়েক কাঁদিলাম, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলাম, তাহার পর আবার সব সহিয়া গেল। ইহাই জগতের অপূর্ব্ব লীলা। শোক যদি মন্দীভূত হইয়া না যাইত, ক্রমে একেবারে অন্তর্হিত না হইত, তাহা হইলে কয়টা লোক বাঁচিত? যাহাদের হৃদয়ে "পুতু পুতু" করিয়া রাখিয়াছি, যাহাদের অবর্ত্তমানে প্রাণ একেবারে যাইবে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহারা চলিয়া গেলে ত আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন করি না, দু'দিন পাঁচদিন হা হুতাশ করি, তাহার পর সব ভুলিয়া যাই; বড় জোর বা স্মরণ করিবার সময় দুই এক ফোটা চক্ষের জল ফেলি, এই ত আমাদের দশা! যাহা হউক, ক্রমে বুক বাঁধিলাম, খাড়া হইয়া উঠিলাম। এক্ষণে আর এক চিন্তা প্রবল হইয়া দাঁড়াইল, যে চিন্তার বেগে সমস্ত দুনিয়া ঘুরিতেছে, অন্ন চিন্তা এমনি ভয়ানক! পেটে অন্ন না থাকিলে অন্য অভাব আর হৃদয়ে স্থান পায় না। পেটের জ্বালায় লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, পূর্ব্বে এ ভাবনা কখন আমায় ভাবিতে হয় নাই, সুতরাং ইহার বেগে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম; সদাই চিন্তা কি করি,

কোথায় যাই, কেমন করিয়া ভগবান দুটা অন্ন করিয়া খাইব? দেশ ছাড়িয়া না গেলে ত আর চলে না, কি করি যাইতেই হইবে, উপায়ান্তর নাই, বাটী ছাড়িতে কত ক্লেশই পাইলাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতা সকলকে মনে পড়িতে লাগিল, যত আনন্দ করিয়াছি, সকলই মনে পড়িতে লাগিল, ঘরগুলার ভিতর যেন তাঁহাদের চেহারা দেখিতে লাগিলাম, স্বর শুনিতে পাইলাম। আহা! এইখানে বাবা বসিতেন, মা এইখানে রন্ধন করিতেন, দাদা এইখানে বসিয়া গীত গাইতেন। সকল স্থানই যেন সচেতন কাব্যময় হইয়া উঠিল, যেন একটি একটি স্থান একটি একটি পুণ্যময় তীর্থ স্থান হইয়া উঠিল। উঃ! পৈতৃক ভিটা ছাড়া কি কষ্টকর! উঠানে মাতার রোপিত একটা আম্র গাছ ছিল, সেটা যেন মাথা নাড়িয়া আমায় বলিতে লাগিল "ছি! ছি! তোমার এই প্রেম, এই দয়া, আমাদের মায়া কাটাইয়া পলাইতেছ," দেয়ালের গর্ত্তে কতকগুলি পারাবত বহুকাল ধরিয়া বাস করিয়াছিল, সেগুলা যেন আমায় তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "ছি, এত নির্দ্দয় হইও না, এমন স্থান আর কোথাও পাইবে না, স্মৃতিদেবী চতুর্দ্দিক সজীব করিয়া রাখিয়াছেন। যে দিকে তাকাও, প্রাণের বস্তু দেখিবে, প্রিয় ভাষা শুনিবে, জগতে ইহার তুল্য পুণ্যময় স্থান আর পাইবে না, যাইও না, এখানে থাক।" এই প্রকারে ভিটা ছাড়িতে আমার হৃদয়তন্ত্রী সমস্ত ছিঁড়িয়া গেল, কি করি অকূল পাথারে পড়িয়াছি, অনন্যোপায় হইয়া পিতৃগৃহে চাবি দিয়া দেশ ছাড়িলাম, সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম, সহায় সম্পত্তি আর কিছুই নাই,

সেই সচ্চিদানন্দের চরণ ব্যতীত আর কোন আশা ভরসাও ছিল না, ভগ্নহৃদয়ে দেশত্যাগী হইয়া চলিলাম, দেখি, হরি চরণে স্থান দেন কি না? গ্রামে কাহারও নিকট কিছু বলিলাম না, যাহা সামান্য দ্রব্যাদি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া পথের সম্বল করিলাম। নিস্তারিণী বলিয়া একটি চাকরাণি আমাদের বাটীতে বহুদিন ধরিয়া ছিল, সে বাটীর পরিজনের মধ্যে গণ্য ছিল, আমাদের বড় ভালবাসিত এবং আমার মাতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপা ছিল, গোপাল বলিয়া স্ত্রীলোকটার একটি ছোট ছেলে ছিল, সে বালককালাবধি আমার বড় অনুগত ছিল এবং আমাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া ডাকিত, আমিও তাহাকে ভালবাসিতাম এবং সর্ব্বদা যত্ন করিতাম, গোপালের মাতা গ্রামের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যায়, তথায় ওলা-উঠা রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করে। সেই অবধি অনাথ বালকটীকে সকলেই স্নেহ করিত। গোপাল বরাবরই আমার পরিচর্য্যায় থাকিত, সুতরাং গৃহত্যাগ করিবার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। তাহাকে ছাড়িয়া যাইব বলায়, এত কাঁদিতে লাগিল যে, আমার মন কেমন করিতে লাগিল, কোন মতে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহার আর কেহ ছিল না এবং সে বড় বিশ্বাসী ও আমায় বড় ভালবাসিত, সুতরাং এ প্রকার একটি লোককে বিদেশে সঙ্গে রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাবিয়া, তাহাকে সঙ্গের সাথি করিলাম। পুরাতন সুখকর সময়ের সে একমাত্র চিহ্ন রহিল। আর সকলই হারাইয়াছি।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কহ আমায়,

হে দয়াময়——কত সাজ সাজিব, কত নাচ নাচিব ?

"ফিরিতে ফিরিতে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় আসিয়া পড়িলাম। এ গ্রামটির নাম জাফরাবাদ, ইহা বিখ্যাত ফরিদপুর হইতে ৮ ক্রোশ ব্যবধানে স্থিত। এখানে একটি বড় জমীদার বাস করেন; নাম নরেন্দ্র নাথ রায়। রায় মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং একজন গোঁড়াহিন্দু, ইহাঁর বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু আজও এত সবল আছেন যে, প্রাতে ২।৩ ক্রোশ পথ না বেড়াইয়া আর বাটী ফিরেন না। রায় মহাশয় অনেক বিজ্ঞ কবিরাজ রাখিয়া একটি দাতব্য ঔষধালয় চালাইতেছেন। একটী টোল চৌবাড়ীও তাঁহার খরচে চলে; অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ইহার অধ্যাপক। একটী নিয়মিত অতিথিশালাও আছে এবং অনেক বিপন্ন বালক বালিকা ও অনাথ পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীলোককে ইনি অন্নদান করিয়া থাকেন। ফলে রায় মহাশয়ের অনেক গুণ এবং যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীও খুব ভাল খাঁটি স্ত্রীলোক। সদাই পতিসেবা ও ধর্ম্মকর্ম্মে সময় কাটান, ইহাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রটী কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং খুব সচ্চরিত্র। ইহার বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর হইয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং ২।৩টি সন্তান

সন্ততিও হইয়াছে। কন্যাটি চিরদুঃখিনী, ইনি নব যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, এমন সুরূপা কন্যা বোধ হয় জগতে কমই পাওয়া যায়। গুণ রূপের অনুরূপ। কিন্তু বিধাতা ইহাঁর কপালে সুখ লিখেন নাই, সপ্তমবর্ষ বয়সে গৌরী-দানের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পিতা ইহাঁর বিবাহ দেন এবং এক বৎসর পরে ইনি বিধবা হন। এই বালবিধবা কিন্তু আদর্শ হিন্দুনারী, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নারায়ণের নাম স্মরণ করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ইনি ঠাকুর পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করেন; পরে পৈতৃক ঠাকুর রাধাবল্লভজির সেবার ব্যবস্থা করেন; দেব-মন্দির ও ঠাকুরের তৈজসাদি নিজ হস্তে পরিষ্কার করেন, পরে মাতাপিতার জন্য আবশ্যকমত ফুল চন্দন ও অন্যান্য সব উপকরণ সংযোগ করিয়া ইনি নিজের আহ্নিক পূজা সমাপ্ত করেন, তৎপরে অতিথিশালায় গিয়া পাকের সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের পর অতিথিদের ভোজন সাঙ্গ হইলে, ইনি বাটী আসিয়া পিতামাতা ও অপর পরিজনদিগের আহারের তত্ত্বাবধারণ করেন। সর্ব্বশেষে একপাকে দুইটী আলু, কাঁচকলা ইত্যাদি দিয়া চারিটা তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া অপরাহ্নে ভোজন করেন, অবশিষ্ট বেলাটুকু অপর গৃহ-কর্ম্মেই অতিবাহিত হয়, তৎ-পরে সন্ধ্যার সময় রাধাবল্লভের আরতি ও শীতল হইয়া গেলে, ইনি দেবমন্দির হইতে আসিয়া মালা লইয়া বসেন। পরে বাটীর পরিজনদিগের রাত্রের আহার সমাপ্ত হইলে নিজের ঘরে ভূমিতে শয্যা পাতিয়া একটী ভাইঝিকে ক্রোড়ে

লইয়া শয়ন করেন, জনেক চাকরাণী তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে, এই রকম করিয়া তাঁহার দিন কাটে, এত অল্পবয়সে, এত নিষ্ঠা অল্প লোকেই করিয়া থাকে। এত যে রূপ, সে দিকে লক্ষ্যমাত্র নাই; কখন আরসী দিয়া মুখ দেখেন না। চুলটী বাঁধেন না, পরিধানে একখানা মোটা চেঁটী, মাতাপিতা ইহাঁর জন্য সদাই নিশ্বাস ও চক্ষের জল ফেলিয়া থাকেন, কিন্তু কি করিবেন উপায়ান্তর নাই। রায় মহাশয়ের পুত্র অখিল বাবুর সহিত আমার বড়ই প্রণয় হইয়াছে, ইনি আমাকে বড় আদর যত্ন করেন ও কোনমতে ছাড়িতে চাহেন না, সমস্ত দিনই ইহাঁর সংসর্গে কাটাই এবং নানা কথোপকথনে ও সঙ্গীত ইত্যাদিতে বেশ সময় কাটে, রায় মহাশয়ের পরিজনদিগকে, যতই দেখিতেছি, ততই ইহাঁদের গুণে আমি বশীভূত হইতেছি, এমন আদর্শ পরিবার আমি কখন দেখি নাই। কর্ত্তাগিন্নি আমায় বিশেষ আদর করেন ও স্নেহের চক্ষে দেখেন। আমি স্থানান্তরে যাইব বলিলে, ইহাঁরা বড়ই দুঃখিত হন এবং আমাকে আপনাদের নিকট রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। অখিল বাবু আমায় বাসা করিতে দেন নাই, আমি ইহাঁদের বাটী-তেই থাকি এবং বেশ সুখসচ্ছন্দে আছি। দেশত্যাগী হও-য়ার পর এমন সুখে আমার দিন কখনও কাটে নাই। একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাকে এখন এইখানেই স্থায়ী হইতে হইল, রায় মহাশয়ের দেওয়ান ও কর্ম্মকর্ত্তা বৃদ্ধ শিবদাস ঘোষাল হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। ইনি বিশেষ কার্য্যদক্ষ ও রায় মহা-

শয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, ইহাঁর বিয়োগে ইনি বিশেষ কষ্ট পাইলেন এবং একজন উপযুক্ত লোক পাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। অখিল বাবুর নিকট একদিন প্রাতে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন চাকর আসিয়া আমায় বলিল "মহাশয়, কর্ত্তাবাবু আপনাকে ডাকিতেছেন"। আহ্বানের কথা শুনিয়া অখিল বাবু মৃদু মৃদু হাঁসিতে লাগিলেন, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "যান না, কর্ত্তা কি বলেন শুনুন না।"

নিশ্চয়ই পিতাপুত্রে আমার সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে, যাহাহউক কর্ত্তার নিকট প্রণাম করিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিলেন এবং কহিলেন "বাবা, তোমাকে আমরা সন্তানের ন্যায় দেখি, তোমাকে দেখা পর্য্যন্ত কেমন একটা মায়া হইয়াছে, সকলকারই, বিশেষ অখিলের, ইচ্ছা তোমাকে আমার নিকটে রাখি, তা বাবা তোমায় অনর্থক রাখিয়া বৃথা সময় কাটাইতে বলিতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় না, তা এখন একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যদি রাজি হও, তবে বড় ভাল হয়। ঘোষাল মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পদে আমার একজন লোকের প্রয়োজন। যোগ্য লোক ত এ অঞ্চলে প্রায় মিলে না, তাই বাবা ঐ কর্ম্ম তোমায় দিতে আমরা মনস্থ করিয়াছি, তুমি গ্রহণ করিলেই সকল মঙ্গল হয়, তা বাবা কি বল? কর্ত্তার কথায় আমার চক্ষে জল আসিল, আমি উত্তর করিলাম "মহাশয়, আপনাদের যত্ন ও প্রেম আমি কখন ভুলিতে পারিব না, যতদিন বাঁচিব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিতে ত্রুটি করিব না, তা আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আমি প্রাণপণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব এবং ভরসা করি, ভগবান্ প্রসাদাৎ আমার চেষ্টাও সফল হইবে”। বৃদ্ধকর্ত্তা আমার উত্তরে অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং বলিলেন “বাবা, তুমি যেমন আছ, তেমনিই থাকিবে, স্বতন্ত্র বাসা করিতে কিম্বা চাকর বাকর রাখিতে হইবে না, তুমি আমাদের পরিবারের মধ্যে একজন। তবে কিনা একটা পারিশ্রমিক চাই, তাই আমি মাসিক ১৫০ টাকা তোমায় খরচ করিতে দিতে মনস্থ করিয়াছি। কেমন বাবা এ বন্দোবস্তে তুমি রাজি আছ ত?” কৃতজ্ঞতার সহিত আমার সম্মতি জানাইলাম এবং সেই দিন হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। অখিল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন মহাশয়, আপনার কবে যাওয়া হইবে? পাঁজি খানা বাহির করিয়া আমি কি শুভ দিন দেখিয়া দিব?” আমি উত্তর করিলাম “আর দিন দেখিতে হইবে না, কার সাধ্য আপনাদের মায়া কাটায়, আপনারা যাদু জানেন, লোককে বশীভূত করিবার আপনাদের এত শক্তি!”

ভগবন্! তোমার লীলা ধন্য! কোথায় আমি পথের ভিখারী, না আজ পদস্থ কর্ম্মচারী! দেব! তোমায় কে বুঝিবে? কে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ননীর পুতলী
যায় বুঝি জ্বলি——ধর ধর ধর বেগে বক্ষে তুলি।

আজ আমার জন্ম সার্থক, রায় মহাশয়ের বিধবা কন্যা সীতাদেবীকে অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আমি সক্ষম হইয়াছি। কি ভয়ানক ব্যাপারই হইয়াছিল, বৃত্তান্ত সব মনে হইলে আমার প্রাণ এখনও কাঁপিয়া উঠে! এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে! ঘটনাটি এই—মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; লোকজন সমস্ত স্নান আহারের জন্য চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একটা গোল উঠিল, "গেলরে, গেলরে" শব্দে চতুর্দ্দিক পুরিয়া উঠিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাটীর বাহিরে যাইলাম; তখন দেখি লোকে উর্দ্ধশ্বাসে অতিথিশালার দিকে ছুটিতেছে, অতিথিশালায় আগুণ লাগিয়াছে, এবং ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে, অতিথিশালাটি পাকা নহে, পাকা মেজের উপর মাটির দেওয়াল, তদুপরি চালা, কক্ষে কক্ষে বিভক্ত শ্রেণীবদ্ধ ও বিস্তৃত, স্থানটি অগ্নিদেবের ক্রীড়ার বিশেষ উপযোগী। দৌড়িয়া গিয়া দেখি উঠানে লোকে লোকারণ্য! কিন্তু অগ্নিদমনের চেষ্টা কেহই করিতেছে না; কেবলমাত্র বৃথা বাক্যব্যয় ও গলাবাজী করিতেছে, ঘরগুলিতে যেমত আগুন লাগিয়াছে তাহাতে শীঘ্রই সব ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, ঘরগুলিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র, কোন ফলই দর্শিবে না, আমি সে

চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করিয়া, কেহ কোন ঘরের ভিতর যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ বাহির হইতে না পারিয়া থাকেন, তাহার তত্ত্ব লইতে লাগিলাম, কাহার নিকট কোন সদুত্তর পাই-লাম না। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় সীতাদেবীর পরিচারিকা "চিন্তার মা" গগন-ভেদী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ওগো দিদি ঠাকুরুণ যে ঘর হইতে বাহির হন্ নাই, তাঁকে যে ঐ ঘরে রাখিয়া আমি ঘাটে গিয়াছিলাম, কি সর্ব্বনাশ হোলো, তোমরা তাঁকে বাঁচাও, ওগো আমি তোমাদের পায়ে পড়চি, ওগো আমার কি হোলো গো" যে ঘরটি চাকরাণী দেখাইয়া দিল, তাহা "দাউ দাউ" করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার চতুষ্পার্শে এত ধূম যে কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না, ভাবিবার আর সময় নাই, দৌড়িয়া গিয়া "দেউড়ী" হইতে দরওয়ানদের একখানা কম্বল লইয়া ভিজাইলাম এবং ঐ ভিজা কম্বল গাত্রে জড়াইয়া সবেগে অগ্নির ভিতর প্রবেশ করিলাম। উপস্থিত লোকেরা "কি কর কি কর" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, আমার সে দিকে লক্ষ্য নাই এবং তাহাদের বাক্য তুচ্ছ করিয়া ভগবানের নাম লইতে লইতে আগুনে ঝাঁপ দিলাম, কষ্টে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম, কিছুই দেখিতে পাই না, ধূমে ঘর আচ্ছন্ন যেন সব একটা আবরণে ঢাকা, একটু পরে কিছু কিছু লক্ষ্য হইতে লাগিল, তখন দেখি এক স্ত্রীমূর্ত্তি পদ্মাসনে স্থিতা, যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে, চক্ষু মুদিয়া পাষাণ-পুত্তলিকাবৎ বসিয়া আছেন, কোন সংজ্ঞা নাই, আপন ভাবেই নিমগ্না,

এত তাপ কাহার সাধ্য সেখানে কেহ তিষ্ঠায়। রমণী কিন্তু নিশ্চলা, অচল অটলভাবে বসিয়া আছেন, মুখে এক অপূর্ব্ব অভিনব শ্রী ও জ্যোতিঃ বিকাশমান। আমার জীবনে এমন দৃশ্য কখন দেখি নাই, দেখিব না। এ বাহ্যশ্রী নহে, বাহ্য রূপের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই, ইহা অন্তরের ভাবজ্ঞাপক মানুষের মনপ্রাণ ভগবানের অনন্ত চরণধ্যানে নিবিষ্ট হইলে যে স্বর্গীয় শোভা মুখে প্রকাশ পায়, এ সেই শ্রী. সেই শোভা ; দেখিলে মন মুগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই, প্রাণ যায়. উত্তাপ একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, আমার শরীরের নানা স্থ ন পুড়িয়া গিয়াছে, "জয় জগদীশ" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম, অমনি ধমনীতে রক্ত তড়িৎবৎ বেগে ছুটিতে লাগিল, গাত্রে যেন অসুরের বল পাইলাম। কোথায় ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন দূরে পলাইল, হুঙ্কার দিয়া সীতাদেবীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম, দৃঢ় করিয়া সযত্নে তাঁহাকে ধরিলাম, ভার কিছুই বোধ হইল না, যেন শোলার মতন হাল্‌কা ; তীরবৎ বেগে ছুটিলাম ; কোথা দিয়া কেমন করিয়া বাহিরে আসিলাম, তাহা মনে পড়ে না, কতকগুলি শব্দ যেন কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল, কাহারা যেন বলিতেছে "আর ভয় নাই", "ধন্য জীবন বাবু" "ধন্য সাহস" কর্ণের নিকট দূরাগত সমুদ্রগর্জ্জনবৎ শব্দ পাইলাম, চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিলাম, কোথায় আছি. কি করিয়াছি. কি হইতেছে আর মনে করিতে পারিতেছি না, সহসা সব অন্ধকার ও স্থির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আসিয়ে ভবে,
বাঁচাহু জীবে—এ ভাব কভু ভুলিব না।

"পরে শুনিলাম আমি সংজ্ঞারহিতা সীতাদেবীকে ক্রোড়ে লইয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াই তাঁহাকে ভূমে শোয়াইয়া দিই, এবং আপনি তৎপার্শ্বে বসিয়া পড়ি; ক্ষণেক পরেই হৃতচেতন—মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহারই গাত্রোপরি ঢলিয়া পড়ি। সীতাদেবীও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের চুল কিছু পুড়িয়াছিল এবং শরীরের স্থানে স্থানে আগুনের আঁচ লাগিয়া ফোস্কা পড়িয়াছিল, গুরুতররূপে কোন স্থানই দগ্ধ হয় নাই, সুতরাং শুশ্রূষা ও সুচিকিৎসার বলে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। আমার ভাগ্যে অন্যরূপ হইল, আমার দুই পদতল দগ্ধ হইয়াছিল ও গাত্রের নানা স্থান পুড়িয়া এমন ভয়ানক ফোস্কা পড়িল যে, তাহার তাড়সে ও যাতনায় আমার উৎকট জ্বর হইল, জ্বর ক্রমে বিকৃত হইল এবং আমি পক্ষাধিক কাল প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলাম এবং সময়ে সময়ে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম। জ্বরের প্রকোপ এত অধিক হইয়াছিল, যে বুড়া কবিরাজ মহাশয় এক সময়ে আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সুচিকিৎসায় এবং ঈশ্বরের কৃপায়, আমি

এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। রায় মহাশয়, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা আমায় এত যত্ন, সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন যে জন্মেও তাঁহাদের সে দয়া আমি ভুলিতে পারিব না; তাঁহাদের ঋণ আমি কোন কালে পরিশোধ করিতে পারিব না; চিরদিনই কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব এবং জগদীশ্বরের নিকট কায়মনে ইহাঁদের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য সতত প্রার্থনা করিব।

সীতা ঠাকুরাণী স্বয়ং আরোগ্যলাভ করিয়া সদাই আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ঔষধ, পথ্য স্বহস্তে খাওয়াইতেন এবং এত যত্ন করিতেন যে বোধ হয় আপনার মাতা, স্ত্রী বা ভগ্নীতেও এত করিতে পারে না, আমার পীড়ার বৃদ্ধির সময় ইনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন; আপনার পদ্মহস্তে আমার গাত্রে মলম লাগাইতেন এবং আমার যে কোন অভাব, তদ্দণ্ডে পূরণ করিতেন। ইহাঁর মাতা আমার কল্যাণে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ফলে ইহাঁদের নিকট আমি না থাকিলে, বোধ হয় এ যাত্রা আর রক্ষা পাইতাম না তিনমাস কাল অত্যন্ত ভুগিয়া আমি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলাম। জীবন মৃত্যু জগদীশ্বরের হাত, সকলই তাঁহার কৃপায় সম্পাদিত হয়, কিন্তু আমার মতন অধমের দ্বারা—কীটাণু-কীটের দ্বারা যে তিনি একটি মূল্যবান জীবন রক্ষা করিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য! কষ্টে, সুখে, দুঃখে—সকল সময়ে, এই প্রীতিকর স্নিগ্ধ স্মৃতির জ্যোতিঃ আমার অনুসরণ করিবে—জীবনের অন্ধকারময় স্থান আলোকিত করিবে।”

নবম পরিচ্ছেদ।

উজল জোছনা,
ফুটেও ফুটে না —জীবনের জীবনে।

"কেন প্রাণে বাঁচিলাম? মরণ ত আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইত, এ যন্ত্রণায় আমি পড়িলাম কেন? হে দেবাদিদেব! হে মঙ্গলময়! আমায় রক্ষা কর, আমায় শান্তি দাও, আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে বিরাজ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। আমি এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না, কাহাকে কি বলিব, হে হৃদয়বল্লভ! মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তুমি জানিতেছ, তোমার অগোচর কিছুই নাই, এখন আমায় সুপথে লইয়া চল, আমার আর কে আছে? কাহাকে দুঃখ জানাইব? আর তাপ দূর করিবার শক্তি ত অন্যের নাই; হে শক্তিধর! আমায় বল দাও, বজ্রের তুল্য আমার হৃদয় শক্ত কর, আমার এ স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত, এখানে থাকিয়া মর্ম্মাহত হওয়া আর উচিত নহে, দুর্ব্বল শরীর মনের এ দুর্দ্দান্ত বেগ কত দিন সহ্য করিবে? সহজেই ভগ্ন হইয়া পড়িবে। "আলায় আলায়" পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। পলাইলাম যেন, আমার মনের আগুন কে নিবাইবে? কেন এমন হইল? পূর্ব্বে ত অনেকবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, এমন বিচলিত হই নাই, পীড়ার সময় শুশ্রূষার দরুণ কি এমন হইল? এখন যে তাঁহার সব নূতন দেখিতেছি, পূর্ব্বে ত এ সব লক্ষ্য হয় নাই, তাঁহার বাহ্য ও মানসিক রূপ দেখিতেছি; যত দেখি

ততই মুগ্ধ হইতেছি, বিষাদের সঙ্গে মনে একটা ভাব উঠিতেছে। উহার বলে সমস্তই অভিনব দেখিতেছি, সকলই সুধাময় হইয়া উঠিতেছে। এ মধুরতা কোথাকার ? পূর্ব্বে যাহাকে কুৎসিত দেখিয়াছি, আজ তাহাকে সুন্দর বোধ হইতেছে। যাহাকে দেখিলে হৃদয়ে ক্রোধ উপস্থিত হইত, আজ তাহার সন্দর্শনে প্রীতিলাভ করিতেছি, জীবমাত্রকেই যেন কোলে টানিতে ইচ্ছা হইতেছে। সংসারে ঘৃণা ছিল, আজ ভাবিতেছি যে চক্ষুষ্মান্, সেই ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। এ যে চতুর্দ্দিকে রত্ন ছড়ান, যে সংগ্রহ করিতে পারে সেই পাইয়া থাকে। ভগবন্! মনুষ্যকে শিক্ষা দিবার তোমার কি কৌশল! সদাই আকর্ষণ করিতেছ, জীবোন্নতির চরম গতিই তুমি! তবে মানুষে প্রেম করা, তোমাকে প্রেম করিতে শিখিবার সোপান মাত্র। আজ আমার হৃদয়ে এ প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু কাহার দ্বারা এ ভাব আসিল ? উল্লেখ করিতেও ভয় হইতেছে, ইনি যে কুমারী নন, হিন্দু বিধবা। এদেশের ঘরে ঘরে চিন্ময়ী সাকারা দেবী সব বিরাজ করিয়া থাকেন, ইনি যে তাহারই অন্তর্গতা। কেমন করিয়া এই সাধুভাবাপন্না পবিত্রা শক্তিরূপার দিকে কামনার চক্ষে তাকাই ? হরি! হরি ! আমি কেন বিড়ম্বিত হইলাম ?

অখিল বাবু গল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পল্লীস্থ কোন কন্যার বিবাহোপলক্ষে বাসর সজ্জিত হয়! তথায় তাঁহার ভগ্নী গমন করেন, বর সীতাদেবীর রূপ গুণ দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলেন যে "ভগবানের লীলা বিচিত্র,

এমন সুলক্ষণা স্ত্রীলোকও বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়, হায়, হায়।” সীতাদেবী নাকি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন “আমি বিধবা নহি, আমার স্বামী আছেন, সে স্বামীকে পাইবার জন্য—আমি কোন্ ছার, জীব মাত্রই ব্যগ্র ; আমার স্বামী ব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই।” যাঁহার মন এত পবিত্র, যিনি জগৎস্বামীকে চিনিয়াছেন, যাঁহার প্রেম অন্তর্ম্মুখী, তাঁহাকে কেমন করিয়া এ গিল্টি করা নকল নিকৃষ্ট প্রেম জানাইব ? না, না, আমি তাহা পারিব না, আমার এ স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, মনের আগুন হৃদয়ে বহন করিয়া দেশে দেশে ফিরিব, দেখিব অন্তর্য্যামী শান্তিদাতা শান্তি দেন কিনা।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিরদয় বিধি
দেখাইয়ে নিধি——গলে তুলে দিল ফাঁস।

আজ অখিল বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন “ভাই জীবন ! তুমি কেন এত কাহিল হইতেছ ? সদাই অন্যমনস্ক, বিমর্ষ থাক, বিষয়কর্ম্মে কিছুমাত্র মন দেও না, কেন, কি হইয়াছে ? আমায় খুলিয়া বল না, আমাকে কি আর ভাই বলিয়া বোধ হয় না ? মনের ভাব খুলিয়া বল, কেন আমার নিকট কোন কথা গোপন কর ?” আমি উত্তর দিতে সক্ষম না হইয়া চক্ষের জল ফেলিলাম, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত ধরিলেন ও বলিলেন “দেখ, আমার এত

বয়স হইয়াছে, কাহারও সঙ্গে কখন বন্ধুতা হয় নাই, তোমার সঙ্গে আমার এই নূতন ভাব, সুতরাং নবপ্রণয়ীর মতন হৃদয় আকর্ষণ ও তথায় আমার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য আমি সদাই ব্যস্ত, তা তোমার ব্যাকুলতা দেখিলে আমার মন কাঁদিয়া উঠে, আমি বড়ই বেদনা পাই, তাই ভাই অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি, বল তোমার কি হইয়াছে ?”

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম “ভাই, যাহা হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম, সে কথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই, বলিলে তুমি হেন বন্ধুও আমার মুখ দেখিতে চাহিবে না, ঘৃণা করিবে এবং ক্রোধে অধীর হইয়া আমাকে যথায় তথায় চলিয়া যাইতে বলিবে, এমত অবস্থায় আমি কি করিব ? তুমিই আমায় বলিয়া দাও”। অখিল বাবু গম্ভীরভাবে স্থির হইয়া আমায় দেখিতে লাগিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলি-লেন “তুমি যেন কোন মহাপাতক করিয়াছ, এমন জানাই-তেছ, কিন্তু তোমার কোন পাতক করা অসম্ভব, আমি বিচক্ষণ না হইতে পারি, পৃথিবীর কার্য্যকলাপ অধিক না না দেখিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য-হৃদয় বুঝিবার আমার যত টুকু শক্তি আছে, তদ্দারা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তোমার মতন লোকে কখনই মহাপাতক করিতে পারে না। তোমাকে এত হীন ভাবিতে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং ভরসা করি, কোন কারণও নাই, তবে কিনা, আপনাকে ছোট করা তোমার স্বভাব। বোধ হয়, কোন

কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, সেই ত্রুটিটুকু তুমি নিজগুণে বর্দ্ধিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড পাতক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ; এখন পাগলামি ছাড়, কি হইয়াছে ধীরভাবে আমায় খুলিয়া বল।”

আমি কি বলিব স্থির করিতে না পারিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়, অখিল বাবু পুনরায় বলিলেন “দেখ, আমি মনের কষ্টে তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিলাম, আশা করিয়াছিলাম সদ্‌যুক্তিদ্বারা তুমি আমার প্রাণ শীতল করিবে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, এক ছাই আর এক ভস্ম, তুমি আমায় ঠাণ্ডা করিবে না আপনি আগুন জ্বালিয়া বসিয়া আছ। তাঁহার কষ্টের কথা আমি শুনিয়া সত্য সত্যই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম, কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম “ভাই, তোমার আবার কি কষ্ট?” অখিল বাবু বিষণ্ণবদনে বলিতে লাগিলেন “ভাই, জগতে কি এমন ব্যক্তি কেহ আছে, যাহার কোন না কোন ক্লেশ নাই, ক্লেশই মনুষ্য-জীবনের উৎকর্ষ সাধনের উপায়, ক্লেশ ছাড়া কেহ নাই। সদ্‌জ্ঞানী—সাধকের ইহা পরমোপকারী, অপরের নিকট ইহা যন্ত্রণাদায়ক, ফলে ইহার ক্ষমতা অসীম ও অনিবার্য্য। সে যাহাহউক, যে বিষয় তোমাকে বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা বড়ই গুরুতর ও গোপনীয়, তুমি ছাড়া অপর কাহার নিকট আমি এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করিতে সাহসী নহি, তবে তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার নিকট কোন কথা আমি গোপন করি না, গোপন করিতে প্রবৃত্তিও হয় না। গৃহদাহের পর হইতে সীতার মন কেমন এক রকম

হইয়াছে, সে ভাল করিয়া আহার করে না, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহে না, দৈনিক যে সব কার্য্য করিত, তাহাতে কোন আস্থা দেখায় না। এমন কি পূজা আহ্নিকও ভাল করিয়া করে না। মাতা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, দাহের দিবস যে মহাকাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার দরুণ মনে আঘাত লাগিয়া থাকিবে, সময়ে সে ধাক্কা ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু এখন অন্যরূপ দেখিতেছেন। সীতা সদাই কাঁদে এবং ক্রমশঃ মলিন হইয়া যাইতেছে, একটা বিষাদের ছায়া স্থায়িভাবে তাহার মুখে স্থান পাইয়াছে। মাতা ইহার গূঢ় কারণ জানিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা ফুটিয়া—মন খুলিয়া কিছুই বলে না বরং সতর্কভাবে সব গোপন করিতে চেষ্টা পায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাতা এই স্থির করিয়াছেন যে সীতা কাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে; নব অনুরাগের যে সমস্ত লক্ষণ, তাহা পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইতেছে, মাতার মতের সঙ্গে আমারও মিল হইতেছে। এখন বিচার্য্য এই যে, সত্য সত্যই যদি সীতা কাহাকেও ভালবাসিয়া থাকে, তবে তাহার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য? আমাদের দেশাচার মতে তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহ এক রকম নিষিদ্ধ, যদিও শাস্ত্রে সীতার মতন বালবিধবার বিবাহ প্রশস্ত, তথাপি দেশাচার ইহার বিরুদ্ধ; আমার পিতাও সেকেলে লোক, যদিও সন্তানের মঙ্গলার্থ তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত, তথাপি এ রকম কার্য্য তাঁহার যে অনুমোদিত হইবে, আমার ত এমন বিশ্বাস হয় না, আর তাঁহার মত থাকিলেও, সীতা কাহাকে

মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। তাহার অনুরাগ সৎপাত্রে সমর্পিত হইয়া না থাকিতেও পারে এবং সৎপাত্র হইলেও তিনি কুসংস্কার প্রভাবে বিধবা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইতে পারেন; এই সমস্ত কারণে আমরা বড় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি; কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। ভগবন! এই ঘোর বিপদের সময়ে আমাকে সৎসাহস ও সুবুদ্ধি প্রদান করুন। হে প্রভো! আমরা তোমার চরণে সদাই নিপতিত রহিয়াছি, এখন এ অধম সন্তানদের রক্ষা করুন।” অখিল বাবুর কথা শুনিয়া আমি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম এবং তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম; কাঁদিতে কাঁদিতে আমি অস্পষ্ট অস্ফুটস্বরে তাঁহার কর্ণে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম বলিয়া এমন হইল যে পৃথিবী যদি ফাঁক হন ত তাঁহার ভিতর আমি প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।”

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একি একি একি কথা,
সত্য সত্য যাবে ব্যথা—ঘুচিবে আঁধার ঘোর।

"সত্য সত্যই সীতাদেবী এ অধমের প্রতি অনুরাগিণী! আমার ভাগ্যে এ ঘটিবে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সকল ঘটনার কর্ত্তাকে কায়মনে ধন্যবাদ দিই! ধন্য জগদীশ! ধন্য তোমার মহিমা! অখিল বাবু এবং তাঁহার মাতার এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে; ফলে অখিল বাবুই ইহার প্রধান ঘটক, তিনি না থাকিলে এ কার্য্য কখনই হইত না। তিনি বলিলেন, "ধর্ম্ম যখন আমার পক্ষে, শাস্ত্র যখন আমার প্রতিপোষক, তখন কেবল ভগ্ন সমাজের বিভীষিকায় আমার ভগ্নীকে চিরদিন কাঁদাইতে পারিব না, তাহার চক্ষের জল না মুছাইতে পারিলে আমাদের শ্রী, সম্পদ কিছুই থাকিবে না।" অখিল বাবু যেমন ধর্ম্মভীরু, তেমনি কার্য্যতৎপর; কোন বিষয় শুভকর বিবেচনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ, শত বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন, কাল বিলম্ব করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কর্ত্তা—বৃদ্ধ রায় মহাশয় অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু এই স্বর্ত্ত করিলেন যে, বিবাহ ভিন্ন স্থানে হইবে এবং আমরা শুভ পরিণয়ের পর অপর কোন স্থানে গিয়া বাস করিব। জাফরাবাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকিবে না। কর্ত্তার এ

াম। গ্রামে এ কথা আমরা প্রকাশ করিলাম না। আমি, খিল বাবু, কর্ত্তা, গিন্নি এবং সীতাদেবী ছাড়া এ কথা কেহ জানিতে পারিল না। তিন মাস পরে বিবাহের দিন স্থির হইল এবং যেখানে বিবাহ হইবে, সেখানে আমরা সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম। সকল বিষয় যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলাম। প্রত্যহ পঞ্জিকা দেখা এবং দিন গণনা করা আমার একটা অত্যাবশ্যক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। মনুষ্য-জীবনের বিচিত্রতা আশ্চর্য্য! আজ যাহা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, কাল তাহা সুসাধ্য; আজ যাহা বিঘ্নকর, কাল তাহা শুভফলপ্রদ; ফলে এই লীলা-ভূমিতে সকলই বিস্ময়কর! ধন্য এই লীলাভূমির অনাদি অনন্তকর্ত্তা!!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অকূল কাণ্ডারী,
দয়াল শ্রীহরি—মিটালে মন সাধ।

"আজ সীতাদেবী আমার; আজ তিনি আমার পরিণীতা ভার্য্যা; আমার সহধর্ম্মিণী; ইহলোক-পরলোকের সুখ-দুঃখ; ধর্ম্মাধর্ম্মভাগিনী; আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা! সুখের কথা আর কি বলিব, আর কেমন করিয়াই বা বলিব। পূর্ণতা যদি কিছুতে সম্ভব, তবে আজ আমার মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ; সুখের বাতাস কতদিন উপভোগ করিতে পারিব?

ভগবানই জানেন। আমরা জাফ্‌রাবাদ হইতে দশ ক্রোশ দূরে সোনাকাটি বলিয়া একখানি গ্রামে বাস করিতেছি। সোনাকাটি রায় মহাশয়ের জমিদারীর অন্তর্গত এবং অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাসস্থান; এখানকার সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্কীর্ণ ভাব নাই; অনেকেই বিশেষ উদারভাবাপন্ন এবং সকলেই আমাদের অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। আমার ভৃত্য গোপাল আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, সে এখন বেশ কার্য্যক্ষম হইয়াছে এবং আমাদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত; গৃহস্থালীর সকল কর্ম্ম প্রায় সে করিয়া থাকে এবং টাকা কড়ির বিষয়ে এত "খারা" যে ব্যয়-ভূষণের ভার তাহার হস্তে দিয়া আমি প্রায়ই নিশ্চিন্ত হই। অখিল বাবুও সর্ব্বদা আসিয়া দেখিয়া যান; তাঁহার ধার এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না এবং দেহে শ্বাস থাকিতে তাঁহার গুণ গান করিতে কখন ভুলিব না। আমার শ্বশুর এবং দ্বিতীয় পিতার স্বরূপ রায় মহাশয়ের নিকটও আমি চিরঋণী রহিলাম। তিনি আমাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত এত অধিক নগদ টাকা দিয়াছেন যে, তাহা খাটাইয়া আমরা, কোন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, সহজেই সচ্ছন্দেই দিন যাপন করিতে পারিব; কাহার দ্বারস্থ হইতে হইবে না। সীতার যে কত গুণ, তাহা এখন জানিতে পারিতেছি, তাঁহাকে যত ভাল করিয়া চিনিতেছি, তত মুগ্ধ হইতেছি। এমন প্রেমিক, সরলা, পতিপরায়ণা স্ত্রীলোক সংসারে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীই ইহাঁর ইষ্টদেবতা ও পতিসেবাই ইহাঁর জীবনের ব্রত। কিসে আমার সুখ-সন্তোষ হইবে,

ইহাঁর সদাই সেই চিন্তা। আমার মুখ একটু শুষ্ক দেখিলে কাঁদিয়া ফেলেন এবং আমার হাস্যবদন দেখিলে আহ্লাদে আটখানা হন। আমার সুখে সুখিনী এবং আমার দুঃখে দুঃখিনী—যথার্থই স্বামীর ছায়ারূপিণী। ভগবানে ভক্তি, বিশ্বাস ইহাঁর প্রগাঢ় ও অটল; যখন চক্ষু মুদিয়া, উৰ্দ্ধমুখে, যুক্তকরে জগৎপিতাকে আরাধনা করেন, তখন ইচ্ছা করে সেই সুন্দর, স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি দেখাই; সমস্ত শরীর নিস্পন্দ ও কণ্টকিত, হৃদয়োচ্ছ্বাসে গণ্ডদ্বয় চক্ষের জলে প্লাবিত, মুখ স্বর্গীয় ভাবে অঙ্কিত, বক্ষঃ ক্ষণে বিস্ফারিত, ক্ষণে সঙ্কুচিত; কৃষ্ণ, কুঞ্চিত ঘন কেশদাম এলাইয়া পড়িয়াছে, উজ্জ্বল শ্বেত গাত্রের রং প্রেমাবেগে প্রভাবিশিষ্ট—ঠিক যেন শ্বেত প্রস্তরের জীবন্তপ্রতিমা। ইচ্ছা হয় সেই মধুর ভাব ও শ্রী একবার সকলকে দেখাই। আমি পড়া শুনা, লোক জনের নিকট যাতায়াত প্রায়ই ত্যাগ করিয়াছি। সীতা-সহবাসে আমার সময় যে কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, তাহার নির্ণয় করিতে আমি অক্ষম। সীতার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট; তাহার কৃষ্ণ-বিষয়ক গীতগুলি শুনিয়া, সকলে চক্ষের জল ফেলেন। পাড়ার ছোট বড় কত স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই গান শুনিতে আসেন। তাঁহারা সময়ে অসময়ে যখনই আসুন না, সীতা সমভাবে, প্রিয়বচনে, সকলকে সমাদর করিয়া গান শুনান। ইহা ছাড়া ইহাঁদের অনেক কর্ম্ম করিয়া দেন; মাঙ্গলিক কার্য্যে শ্রীগড়া, তত্ত্বতাবাসের সময় খদিরের খেলানা প্রস্তুত করা, চন্দ্রপুলি ও খিরের সামগ্রী করা, পড়সি স্ত্রীলোকদের হইয়া তাঁহাদের বিদেশস্থ আত্মীয়

স্বজনগণকে পত্র লেখা, বিবাহোপলক্ষে বাসর জাগরণ ও সজ্জা করা, চুল বাঁধা, আলিম্পনা দেওয়া, বিচিত্র হরেক রকমের বড়ি ও আচার প্রস্তুত করা ইত্যাদি নানাকর্ম্ম ইহাঁ কর্ত্তৃক পরের জন্য সম্পাদিত হইত। রামের মা জ্বরে পড়িয়া আছে, তাহার ঔষধ পথ্য পাঠাইতে হইবে, ব্রাহ্মণ-বালক কেনারামের অর্থাভাবে লেখা পড়া হয় না, তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। উহার কন্যাদায়, উহার পিতৃদায়, কিছু দিতেই হইবে, ইত্যাদি যে যখন যে বিষয় অভাব জানাইবে, দয়াময়ী সীতা ঠাকুরাণি তখনই অভাব মোচন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইবেন। দুঃখ দেখিলে তিনি থাকিতে পারিবেন না, যেমন করিয়া হৌক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা হইবে। অন্নদান করাও তাঁহার একটা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অঙ্গ। যদিও আমি তাঁহার পিতার মতন ধনী নহি এবং তাঁহার মতন অতিথিশালা খুলিতেও অক্ষম, তথাপি আমার দ্বার হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। সীতাদেবী স্বয়ং আহার না করিয়া তাহাদের আহারী-য়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। বাহুল্যভয়ে সীতার আর আর গুণের উল্লেখ করিব না, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এই রত্নটি আমি ধারণ করিতে পাইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছি। হরি করুন এই প্রকারে আমার অবশিষ্ট জীবন যেন কাটিয়া যায়।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শুন তার ধারা,
সব সৃষ্টিছাড়া——পাগল পারা রীত।

শুভদিনে, শুভলগ্নে অদ্য আমার একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কন্যাটি দেখিতে বড়ই সুশ্রী হইয়াছে—যথার্থই সীতার অনুরূপা; দেখিতে দেখিতে তাহার অন্নপ্রাশন আসিয়া উপস্থিত হইল; সুশ্রী বলিয়া তাহার নাম শ্রী রাখিলাম। সময় জলের মত যাইতেছে, শ্রী এখন তিন বৎসরের হইয়াছে এমন অদ্ভুত বালিকা আমি কখন দেখি নাই, ইহার ভয় ডর নাই, যে সব উপকথায় অপর বালক বালিকারা ভয় পায়, শ্রী তাহা শুনিয়া হাসে, অন্ধকারে যথায় তথায় যায়, একটুও সঙ্কুচিত হয় না, আমাদের বাটীর নিকট একটা বড় বাগান আছে, রাত্রে তথায় লোকে যায় না, বলে ভূত আছে। একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীকে বাটীতে পাওয়া গেল না, মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, বহু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, শ্রী ঐ বাগানের একটা চাঁপা গাছের তলায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাটী আসিয়া বলিল "কেন তোমরা আমায় আনিলে, আমি সেখানে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলাম, কেমন সুন্দর ছেলে মেয়ে—যেন আলোকে তাহাদের শরীর জ্বলিতেছে, তাহারা গান গাইতে লাগিল, গান শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম," শ্রীর কথা শুনিয়া তাহার মাতা "ষাট্, ষাট্" করিয়া তাহাকে কোলে

টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মেয়েটা সমবয়স্কাদের সঙ্গে মিশে না এবং তাহাদের খেলা ধূলায় যোগ দেয় না। নুড়ি পাথরে সিন্দুর মাখাইয়া ফুল দিয়া পূজা করিতে বড় ভালবাসে এবং অস্ত্রাদি দেখিলে বলে "আমি ঐ সব লইয়া খেলিব।" একবার আমাদের গ্রামে একটি ভৈরবী আসেন। শ্রী তাঁহাকে দেখা পর্য্যন্ত অন্য বেশ ভূষা করিতে চাহে না, বলে আমাকে "তার মতন সাজাইয়া দাও।" উহার ইচ্ছামত, সীতাদেবী একটী ছোট ত্রিশূল গড়াইয়া গৈরিক বসন ও বনফুল ও রুদ্রাক্ষের মালায় তাহাকে সাজাইতেন। আহা! কি সুন্দরই দেখাইত! সকলে দেখিয়া অভিভূত হইত এবং বলিত "সময়ে এ একটা মহাশক্তিশালিনী স্ত্রীলোক হইবে, সাধন কল্লে এ উচ্চ স্থান গ্রহণ করিবে" ভগবানই জানেন, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, ফলে কন্যাটি অদ্ভুত, অপরের সঙ্গে ইহার কিছুই মিল নাই; যেন সৃষ্টিছাড়া।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুখময় দিন,
রবে চিরদিন——এমতি মনে লয় না।

"কয় বৎসর ধরিয়া যে সুখশান্তি ভোগ করিতেছি, বিধাতার তাহা বুঝি সহ্য হইল না। সুবাতাস গিয়া আবার ঝড় দেখা দিল। সত্য সত্যই মনুষ্য-জীবন চক্রবৎ ফিরিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে। ক্ষণেক আলোক, ক্ষণেক অন্ধকার। কিছুই স্থায়ী নহে, পরিবর্ত্তনই জগতের একটী মুখ্য নিয়ম। আমি পুনরায় কষ্টে পড়িলাম, এবার এ আর্থিক কষ্ট। আমার শ্বশুর মহাশয় আমাদের ভরণপোষণের জন্য যে নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা আমি নবকুমার হালদার নামক এক ব্যক্তির নিকট খাটাইতে দিই; নবকুমারকে আমি চিনিতাম না। ইহার বাটী জাফরাবাদে এবং অখিল বাবু ইহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়া দেন। অখিল বাবু ইহাকে পরমধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী বলিয়া জানিতেন, জানিবার কারণও ছিল; এই নবকুমার একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং বহুকাল হইতে আমার শ্বশুরের টাকা কড়ি নানা স্থানে খাটাইত। ইহাঁদের পিতাপুত্রের—এত বিশ্বাস ছিল যে, নবকুমারকে বিনা রসিদে বিস্তর টাকা ছাড়িয়া দিতেন। সে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই, বরং নানা সময়ে বিশেষ প্রলোভন সত্ত্বেও, আপনার ধার্ম্মিকতা দেখাইয়াছে, কিন্তু এবার আমার ভাগ্য-দোষেই হউক, বা

অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক, সে আমার সর্ব্বস্ব ও শ্বশুর মহাশয়েরও বিস্তর টাকা লইয়া কোথায় যে পলাইল, তাহা আর নির্দ্ধারণ করিতে পারা গেল না। বিস্তর অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহার ঠিকানা কোন মতেই পাওয়া গেল না। গ্রামে তাহার সামান্য স্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহাতে আমাদের টাকা আদায়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং আমাদের টাকাগুলা একেবারে জলে পড়িল।

শ্বশুর মহাশয় মহা ধনী; তাঁহার এ ক্ষতি গায়ে লাগিবে না; কিন্তু আমি একেবারে পথের ফকির হইলাম। সীতার নিকট তাহার গাত্রের গহনা ও ২০০০ টাকা নগদ ছিল, ইহাই আমাদের এখন একমাত্র সম্বল রহিল শ্বশুর মহাশয় ও অখিল বাবু আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের নিকট পুনরায় কিছু গ্রহণ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক হইলাম। কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিতে মনস্থ করিলাম এবং বিদেশে কর্ম্ম পাইবার চেষ্টাও করিতে লাগিলাম। উপস্থিত খরচ পত্র সীতার টাকায় চলিতে লাগিল। সীতার মহত্ত্বগুণে আমি এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও, কোন কষ্ট অনুভব করিলাম না। তাঁহার এই বিপদের সময় মনের শান্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম এবং তাঁহার আদর যত্নে ক্ষতির বিষয় একবার ভাবিতেও অবসর পাইলাম না। সদাই বলিতেন "তুমি ও শ্রী বাঁচিয়া থাক, আমি অপর ধনসম্পত্তি চাহি না; ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, তোমাদের মতন রত্ন তিনি আমায় দিয়াছেন, তাঁহার এই কৃপায় আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি,

এখন আশা এই যে, তোমাদের রাখিয়া আমি তাঁহার চরণ-তলে অগ্রে যাইতে পারি, পরে আবার সব মঙ্গলালয়ে যেন মিলিত হই। টাকায় সামান্য ইষ্ট আছে, কিন্তু অনিষ্টের ভাগই অধিক; এমন আপদ পরমেশ্বর নাশ করিয়া দিয়াছেন, ইহা ত ভাগ্যের কথা, আমাদের এক বিড়ম্বনা গিয়াছে, এখন তুমি দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া আমাদের যাহা খাইতে দিবে, তাহা এত আনন্দকর হইবে যে, বোধ হয়, সমস্ত পিতৃধন ব্যয় করিলে, সে আনন্দের শতাংশের এক অংশও পাইবার আশা নাই। এখন কায়মনে হরির চরণে এই প্রার্থনা করি যে, তুমি নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হও।”

হ্যাঁগা এখন তোমাদের দশ জনকে জিজ্ঞাসা করি, সীতার মতন উজ্জ্বল রত্ন তোমরা কয়জনে দেখিয়াছ? এ রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া কি আমি সুখী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারি না? আমার সুখ কি খাঁটি নহে?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হর মোর জ্ঞান,
যাক্ মোর প্রাণ——যাক্ সব রসাতলে।

"পৃথিবীতে আমি কাঁদিতেই আসিয়াছি ; কান্নাই আমার সম্বল; আমি যে জন্মজন্মান্তরে কত পাতক করিয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নচেৎ আমার এত ক্লেশ কেন ? জ্ঞান হওয়া অবধি কেবল দুঃখভোগই করিতেছি, দুই চারি দিনের জন্য কেবল সুখের বাতাস বহিয়াছিল, তাহা উপভোগ করা দূরে থাকুক, উপলব্ধি করিতে না করিতে, একেবারে বিষম যন্ত্রণায় পড়িলাম। হে ভগবন্! আমায় রক্ষা কর, আমার বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইব ? কেন আমার এ সর্ব্বনাশ হইল ? কেন আমার প্রাণের সীতা আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল ? সীতা কি সত্য সত্যই নাই ? লোকে বলে সাধ্বী স্বামী রাখিয়া বেশ চলিয়া গিয়াছে, আমি ত তাঁহাকে যাইতে দেখি নাই, সামান্য জ্বর হইয়াছিল, শ্রীকে কোলে লইয়া আদর করিলেন, মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া আমাকে আশ্বাসিত করিলেন। প্রাণ ভরিয়া ভগবানের আরাধনা করিলেন। পূর্ণ সহাস্য বদন দেখিলাম। মহাপ্রস্থানে যাইবার ত কোন চিহ্ন দেখি নাই, একদিন ভোর রাত্রে কেবল বলিয়াছিলেন "তুমি আমার জীবন্ত দেবতা, একবার পা দুখানি আমার মস্তকে দাও, আমি সশরীরে স্বর্গভোগ করি, এমন সময় আর পাইব

না। শ্রী ঘুমাইতেছে, উহাকে দেখিও এবং আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমার সেবা করিতে পারিলাম না, এই আমার দুঃখ; নচেৎ ভগবান আমাকে আর সকল বিষয়ে সুখী করিয়াছেন।” এই কথাগুলি বলিয়া, আমার পদধূলি মস্তকে লইয়া, সীতা অনিমেষলোচনে—প্রাণ ভরিয়া—শ্রীকে দেখিলেন, তৎপরে আমার হাতে হাত দিয়া হরিনাম করিতে করিতে বালিশে মাথা দিয়া শয়ন করিলেন। মুখে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল, সর্ব্ব শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইল, চক্ষু মুদিয়া আসিল। এই সময় কোথা হইতে অপূর্ব্ব, মিষ্ট অমানুষিক বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। এমন সুশ্রাব্য, সুললিত বাদ্য আমি কখন শুনি নাই; ইহা কখন মনুষ্যহস্তনিঃসৃত নহে; স্বর্গীয় লোকে স্বর্গীয় বাদ্যবাদন করিতেছিলেন; এ স্থানে এ সময়ে কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক ইহা হওয়া অসম্ভব। আমার শরীর কণ্টকিত হইল, কাহাকেও দেখিলাম না, কিন্তু ঘরে পদ শব্দ স্পষ্ট শ্রুত হইল। সীতা শুনিয়া বলিলেন “ঐ শুন, আহা! কেমন মিষ্ট, ভগবান এ পাতকিনীর প্রতি এত দয়া, ধন্য তোমার মহিমা!” সহসা ঘরের একস্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন “দেখ, দেখ আমার স্বজনেরা সব আসিয়াছেন, ঐ যে আমার মৃত ভাই কৃষ্ণ, ভাই কৃষ্ণ এতদিন পরে মনে পড়িয়াছে, তা চল, চল, আর বিলম্ব করিব না।” কথা সমাপন করিয়া সীতা শুইয়া পড়িলেন। যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সেখানে স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ আলোকরাশি ব্যতীত অপর কিছু দেখিলাম না, সূর্য্যদেব সেই সময় ব্রহ্মমূর্ত্তি

ধারণ করিয়াছিলেন, ঘরটি ক্রমে আলোকিত হইল, সীতার ত অন্য কোন বৈলক্ষণ দেখিলাম না। ঠিক্ যেন সুস্থিরভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন, সূর্য্যরশ্মি মুখে পড়িয়াছে, রূপ যেন উথলিয়া পড়িতেছে, আহা! এমন শ্রী আর কখন দেখিব না। গোপাল ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গেল, গোপাল কাঁদে কেন? সত্য সত্যই কি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে? না না, সীতা—আমার সীতা—জীবনের জীবন যে ঘুমাইতেছে, একবার গিয়া দেখিয়া আসি। আগন্তুক ভদ্রলোকেরা নিষেধ করিয়া হাত ধরিয়া বসাইলেন, ইহারা এমন করিতেছেন কেন? সকলেই ম্লান, সকলেই আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন, সীতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া কি? এরা আবার কি বলেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অ্যাঁ কি? সীতা নাই—সীতার মৃত্যু হইয়াছে! আর আমি এখনও জীবিত! আমাকে ধিক্! মাথা ঘুরিতেছে, আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না সব অন্ধকার—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কাঁদিতে আসিনু,
কাঁদিয়ে যাইনু—কান্নাই সার এ জীবনে।

"আমি এখন পথের ফকির, বিষয় আশয় গিয়াছে এবং জীবনের অপেক্ষা যে প্রিয়বস্তু—যাহা আমার সংসারের প্রধান বন্ধনী, নিতান্ত প্রিয় ও সুখকর, তাহাও গিয়াছে, এ দগ্ধ হৃদয়ে যে শক্তি, প্রেম ও শান্তি সঞ্চার করিত, সে সীতা ধনেও আমি বঞ্চিত হইলাম, আমি প্রকৃতপক্ষে এখন লক্ষ্মীছাড়া—কাঙ্গাল। হে কাঙ্গালের ধন, পতিত-পাবন, এখন এ অধম সন্তানকে চরণে স্থান দাও। আমার অপর কামনা আর কিছুই নাই, নিরাশ্রয়কে কোলে টানিয়া লও। আমি অভাগা, মূর্খ, ভজন-সাধন-বিহীন, মন্দ কর্ম্মফলরূপ চক্রে ঘূর্ণায়মান, আমাকে রক্ষা কর, আমার ভববন্ধন ঘুচাইয়া দাও, যেন "দীর্ঘ মেয়াদে, এ সংসার গারদে" থাকিতে না হয়, যেন তোমার পদাশ্রয় পাই, অনন্তকাল তোমার ভজনজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করি! সীতার অভাবে সবই যেন কেমন খাপছাড়া বোধ হইতেছে, কিছুতেই আর সুখ পাই না, এমন কি শ্রীকে ক্রোড়ে করিয়া শান্তি পাই না। সদাই মনে আগুন জ্বলিতেছে, কি করিলে জুড়াইতে পাই? প্রথম ত আমার এ স্থান ত্যাগ করা আবশ্যক, কারণ এখানে সকল বস্তুই যে সীতা জনিত শোক জাগরূক করিয়া দেয়, তৎপরে সীতার যে প্রতিমা আমার

হৃদয়াসন অধিকার করিয়া আছে তাহাকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে জগৎকর্ত্তা জগদীশকে হৃৎকমলে বসাইব। ছায়া ত্যাগ করিয়া, প্রকৃত বস্তু ধরিব। আর নকল, ধ্বংসমূলক অসারে মনপ্রাণ সমর্পণ করিব না। দেখি গুরু-দেবকে আয়ত্ত করিতে পারি কি না? প্রেম-ডোরে বাঁধিতে সক্ষম হই কি না? সংসার ত্যাগ করিতে ত কৃত-সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু শ্রীর ব্যবস্থা কি করিব? তাহাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করি? মাতুলালয়ে তাহাকে পাঠাইব না, সমাজভয়ে ও সংস্কারগুণে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে লইতেও অনিচ্ছুক হইতে পারেন। সীতারও পিতৃগৃহে শ্রীকে কখন পাঠাইতে বিশেষ অমত ছিল; কতবারই আমায় বলিয়াছেন "দেখ, যদি কখন আমার ভালমন্দ হয়, তোমার অগ্রে আমি চলিয়া যাই, তবে শ্রীকে আমার পিতৃ-গৃহে কখনও পাঠাইও না, আমার সোনার শ্রীকে কেহ অনাদর করিবে, তাহা আমার প্রাণে সহিবে না, আমি যেখানে থাকি—ভগবান যে লোকে আমায় লইয়া যান না কেন, আমি সেখানেই অতৃপ্ত হইব, আমার শান্তি থাকিবে না, উহাকে আপনার নিকটেই রাখিবে, যদি তাহা কোন কারণ বশতঃ না পার, তবে গোপালের হাতে উহাকে সঁপিয়া দিও, গোপাল দুঃখীর সন্তান, লেখা পড়াও জানে না, কিন্তু ও খাঁটি সোনা, ওর হৃদয় মহৎ, আমাদের ও ভালবাসে, বিশেষ শ্রী ওর নিতান্ত প্রিয়, উহার হস্তে শ্রীকে সহজেই সমর্পণ করিতে পারিবে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ করিও না, প্রেমিক হৃদয় বুঝিতে আমার পূর্ণ অধিকার

আছে,” রতনেই রতন চিনিতে সক্ষম। সীতা স্বয়ং পূর্ণমাত্রায় খাঁটি ছিলেন, সুতরাং তিনি যে অপর খাঁটি লোককে চিনিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? এমন মহানুভাব, প্রশস্ত, বিশালহৃদয় আমি স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখি নাই। এই সময় একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। আমাদের পাড়ার ভদ্র ঘরের একটি স্ত্রীলোক, একদিন সীতাকে বলেন যে, আমি গ্রামস্থ অপর এক বিখ্যাত সুন্দরীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; সীতা ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন,“আমি এ কথা বিশ্বাস করি না; আমি জানি, আমার স্বামী আমায় প্রাণের সহিত ভালবাসেন; তাঁহার অপরকে ভালবাসিবার হৃদয়ে স্থান নাই, কিন্তু সত্য সত্যই যদি তিনি অপরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি জানিব যে, আমার দ্বারা তাঁহার অভাব মিটে না; সুতরাং যে অভিলাষ অসিদ্ধ থাকে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য যদি প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তবে তাহা প্রেম নহে, লালসামাত্র; আর যে আমার স্বামীর তিলার্দ্ধ কোন সুখ সম্পাদন করে, এমন কি গাত্রের ঘামাচিটি পর্য্যন্ত মারিয়া দেয়, সে আমার বন্ধু, আদরের সামগ্রী এবং আমি তাহার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিব।” এমন কয়জন স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়? আমি বড় মন্দভাগা, যে এমন স্পর্শমণির সংসর্গে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারিলাম না। সীতার বাক্য আমার সকল সময়েই শিরোধার্য্য ছিল, এখন তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে, সুতরাং আমি গোপালের হস্তে শ্রীকে সমর্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। সব ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণ পাইতে চেষ্টা করিব, দেখি গুরু কৃপা করেন কি না?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যাই যাই মনে করি,
পুন আসি ফি'রি ফিরি—এ দায়ে কি করি ?
রাখ হে শ্রীহরি।

"গোপালকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাবা ! তোমাকে আমি সন্তানের ন্যায় দেখি, বালক কাল হইতে বিশেষ স্নেহ করি। আমার মৃতা স্ত্রীও তোমাকে পেটের ছেলের মতন ভালবাসিতেন ও যত্ন করিতেন, এখন আমাদের প্রেমের কিছু প্রতিদান কর, আমার এই ভিক্ষা ; আমি নানা কারণে বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে যাইতেছি, কবে ফিরিব বলিতে পারি না, একেবারে না ফিরিতেও পারি ; কারণ মনুষ্যের আয়ু কখন শেষ হয় কে বলিতে পারে ? অল্প দিনের জন্যই হউক বা বহুদিনের জন্যই হউক, আমি শ্রীকে তোমার হস্তে সঁপিয়া দিতেছি, তুমি আপনার মার পেটের ভগ্নীর মতন, উহাকে লালন পালন করিবে। যে টাকা তোমার হাতে দিয়া যাইব, তাহাতে তোমাদের দুইজনের ভরণ পোষণ সহজেই হইবে, অন্নের জন্য তোমাদের কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না, আমার ইচ্ছা, তুমি এ অস্বাস্থ্যকর স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীকে লইয়া গঙ্গাতীরে কোন ভদ্রপল্লীতে বাস কর। তথায় উহাকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা কাহার দ্বারা দিও। ও বড় সঙ্গীত ও ব্যায়ামপ্রিয়, কিছু শিক্ষা এই দুই বিষয়ে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। আর উহাকে প্রাণের সহিত যত্ন ও প্রেম করিও, তুমি উহার মাতাপিতার স্থলাভিষিক্ত হইলে,

সুতরাং মনে প্রাণে উহার মঙ্গল সাধন করিবে। ভগবানে তোমার প্রেমভক্তি বিশেষ আছে, তোমার সেই প্রেমভক্তি উহাকে শিক্ষা দিও। যাহাতে শরীর ভাল থাকে, বিধিমত তাহার চেষ্টা করিও এবং সুশিক্ষা দিতে কোন মতে ত্রুটী করিও না। আমার এই ভার গ্রহণ কর, ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন; এখন আশীর্ব্বাদ করি সুস্থশরীরে, সুস্থ মনে, কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হও। যদি কখন কোন কষ্ট হয়, উহার মাতুলালয়ে জানাইও না, ভগবানের উপর নির্ভর করিও, তিনি তোমাদের কষ্ট দূর করিবেনই, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি অগতির গতি, দুর্ব্বলের বল, অধমতারণ, পতিতপাবন। অবশ্য নিরাশ্রয়া, অনাথা বালিকার মঙ্গল সাধন করিবেন। আমি যেখানে থাকি না কেন, আমার প্রেম ও কায়মনের আশীর্ব্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিবে এবং ভরসা করি, বিপদকালেও রক্ষা করিবে। পিতামাতার, প্রেমিক মাত্রেরই সু-ইচ্ছা এত প্রবল, যে তাহা স্থান, কাল, দূরত্ব মানে না। সকল সময়েই সুফল প্রদান করে; আমার বিশ্বাস, আমার স্বর্গীয়া স্ত্রীরও ইচ্ছা তোমাদের রক্ষা করিবে এবং ইচ্ছাময় স্বয়ংও তোমাদের কৃপা করিবেন।" আমার কথা শেষ হইলে গোপাল আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং উত্তর করিল, "প্রাণ দিয়া আপনাদের ধার আমি শুধিতে পারিব না, শ্রীর এক গাছা চুল রক্ষা করিতে যদি আমার জীবন যায়, তবে আপনাকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিব, এখন ভগবান আমার এই জীবনের ব্রত পালন ও সমাপন করিতে শক্তি দিন,

শ্রীকে লালন পালন করিয়া, ভাল ঘর বরে সমর্পণ করিয়া আমি যেন মরিতে পারি। আপনাদের নিকট যেটুকু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছি, যে সুশিক্ষা পাইয়াছি, তাহা যেন ফলে পরিণত করিতে পারি। শক্তিধর যেন সুমতি, সুবুদ্ধি সদা আমাকে দেন। তাঁহার ইচ্ছাধীন হইয়া আমি সকল কার্য্য যেন সম্পন্ন করিতে পারি, এখন আপনাদের দুই জনকে হারাইয়া আমরা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব।" গোপালকে আমি বুঝাইয়া প্রকৃতিস্থ করিলাম, টাকা কড়ি গহনা ইত্যাদি সমস্ত তাহার হস্তে প্রদান করিলাম এবং ভবিষ্যতে চলিবার উপায় ও সদ্যুক্তি বারংবার বলিয়া দিলাম, সকল বলিয়া কহিয়াও যেন তৃপ্তি হইল না, ভাবিলাম কি যেন বলা বাকি রহিল।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মন আঁটি বল করে,
তার ছেঁড়ে বারে বারে—করি কি উপায় ?
পরাণ যে যায়।
মুখটি তুলিয়ে,
হাসিয়ে হাসিয়ে——সোহাগে ধরিয়ে রহিল হাত।

"কন্যাটি ত্যাগ করা যত সহজ বিবেচনা করিয়াছিলাম, কার্য্যতঃ তাহা নহে। এত আঘাত লাগিবে, তাহাও জানিতাম না। হৃদয়তন্ত্রী সব ছিন্ন করিতে হইবে, তা কি করিব, যখন সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণ পাইবার চেষ্টা

আমায় করিতে হইবে, তখন এ সব কষ্টের দিকে লক্ষ্য করা বিড়ম্বনা মাত্র। হে ঠাকুর! আমায় বল দাও; আমার মন পাষাণময় কর; আমি বল পাইয়াছি, হরি আমায় রক্ষা করিয়াছেন, আজ ভোর রাত্রে বাটী ত্যাগ করিয়া যাইব। জয় জগদীশ! কৈ, বাটী যে ত্যাগ করিতে পারিলাম না, শ্রী ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জন্মের মত একবার দেখিয়া লইবার ইচ্ছা হইল। বিছানার নিকট যাইলাম, দেখি শ্রী ঘুমাইয়া হাঁসিতেছে, কি যেন বলিতেছে, সহসা গাল ভরিয়া হাঁসিয়া উঠিল এবং "বাবা, বাবা," করিয়া ডাকিয়া উঠিল, আমি "থাক, থাক," বলিলাম; অন্য দিন ঐ কথা বলিলে যথেষ্ট হইত, আজ কোন ফলই ফলিল না, শ্রী ব্যগ্রভাবে উঠিয়া বসিল এবং বলিল "বাবা, তুমি কি আমায় ফেলিয়া পলাইতেছিলে? কে যেন তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, আমি তাহা দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।" ধন্যরে জগতে প্রেম! কি বিষম শক্তি ইহার! এই বালিকাও আপনার প্রেমের বলে জানিতে পারিয়াছে যে, তাহার প্রেমের বস্তু তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাই উঠিয়া বসিল এবং আমার হাত ধরিল, আমার সে রাত্রে আর গৃহত্যাগ করা হইল না।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দয়াল নামটি ধর,

রক্ষা কর রক্ষা কর——ঘুষুপ মহিমা তোমার।

"আজ চলিয়া যাইব, কোন বিঘ্নবাধা মনিব না, হৃদয় শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছি, আমায় আটকায় কে? কাহার সাধ্য? আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বালির বাঁধের মতন, ভাঙ্গিয়া গেল; যাই যাই করি আর যাওয়া হয় না, বড় কাতর হইলাম, কাতর প্রাণে ভগবানকে ডাকিলাম, অমনি বল পাইলাম, মায়া কাটাইতে সক্ষম হইলাম ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত, মনুষ্য কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না, যাহাদের প্রিয় ভাবিয়া হৃদয় সিংহাসনে এতদিন যতনে বসাইতাম, তাহাদের দূরে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে জগন্নাথকে বসাইব, দেখিব হৃদয়বল্লভ চরণপ্রান্তে স্থান দেন কিনা? জয় জগদীশ! জয় কৃষ্ণ! আমি অধম, পাতকী, নিরাশ্রয়, অকূল পাথারে পড়িয়াছি, আমায় রক্ষা কর, রক্ষা করিবার শক্তিও অপর কাহার নাই—হা ভগবন!!"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

করি মন প্রাণ একতান,
আজ কর বিভু গুণ গান সচেতনে সযতনে,
এই শুভ সংমিলনে।

জীবনের হস্তলিখিত খাতাখানি পাঠ করিয়া, বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং এত কাতর হইলেন যে, গোপাল তাঁহাকে কোনমতে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ অশ্রুপাত করিয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন "আমি কি পাতকি। আমারই জন্য জীবন সংসার ত্যাগ করিয়াছে, আমি যদি তাহাকে না ছাড়িয়া যাইতাম, তাহা হইলে এমন কখনই ঘটিত না, আমি নরাধম, আপনার সুখ স্বচ্ছন্দ লইয়া ব্যস্ত, ভাইকে একবার স্মরণও করি নাই। হায়, হায়, কি হইল, কোথায় যাইলে প্রাণের ভাই জীবনকে পাই? ওরে গোপাল, আমিই তোর প্রভুর অগ্রজ. আমারই নাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,—আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া ঢাকায় যাই, তথায় বুড়ো বয়সে বিবাহ করি এবং তত্রত্য নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই, নবাব সাহেব আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমার পদোন্নতি করিয়া দেন, আমি এখন একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী, মা ষষ্ঠীরও আমার প্রতি কৃপা হইয়াছে। আমি একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করিয়াছি, কয় বৎসর ধরিয়া ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে। কিন্তু একবার ত ভাইকে মনে করি নাই, হায়, হায়, আমার মতন পাপাত্মা আর কে আছে? দেখ, ভগবানের কি খেলা, যে ভাইকে

আপনার সুখে সুখী হইয়া ভুলিয়াছিলাম, সেই ভাইয়ের কন্যা আজ আমায় সপরিবারে ধনে প্রাণে বাঁচাইল। শ্রী না থাকিলে, আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেছ। ভাইকে হারাইয়াছি, এখন ভাইঝিকে বুকে করিয়া সে শোক ভুলিব। জগদীশ! তুমি ধন্য! কি অঘটন ঘটাইয়া আমাদের মিল করাইলে, তা জীবন উপস্থিত থাকিলে কি সুখই হইত।" হরিচরণ পুনরায় চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন, গোপাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পদ-ধূলি লইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভগবান আমার ডাক শুনিয়াছেন, আমি বড় কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিয়া-ছিলাম, আমি প্রার্থনা করিতাম, ঠাকুর! আমি খঞ্জ হইয়াছি, চলৎশক্তি রহিত হইয়াছি, শ্রীকে রক্ষা বা ভরণ পোষণ করিবার আমার শক্তি গিয়াছে, শ্রী বড় ঘরের কন্যা হইয়া উদরান্নের জন্য পাটনির কায করিতেছে, এখন নিরুপায়ের উপায় তুমি, শীঘ্র তাহার উপযুক্ত অভিভাবক মিলাইয়া দাও, তা আমার ক্রন্দন তিনি শুনিয়াছেন, আপনাকে আনিয়া দিয়াছেন, এখন আপনার হাতে শ্রীকে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি, নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিঘ্নে হরি নাম করিব।"

হরিচরণ জীবনের গৃহত্যাগের পর কি কি ঘটিয়াছিল, জানিতে চাহিলে, গোপাল বলিল—জেঠা মহাশয়, বাবা আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলে আমরা কিছুদিন সোনাকাটিতেই বাস করিলাম। কিন্তু স্থানটা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া শ্রীর সর্ব্বদাই অসুখ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ

পিতামাতার জন্য সে সময়ে সময়ে এমন কাতর হইত যে, সোনাকাটি ত্যাগ করা আমি শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। পিতা গঙ্গাতীরে বাস করিবার আজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমি এইখানে আসিয়া বাস করি ও প্রথমে এই কয়খানি ঘর খরিদ করি; এখানি ভদ্রগ্রাম, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস, ইহাঁরা শ্রীকে দেখিয়া এবং উহাকে অনাথা জানিয়া যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। একজন কথকতা-ব্যবসায়ী উহাকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং সঙ্গীতে ওর অনুরাগ দেখিয়া গানও শিখাইতে লাগিলেন, ক্রমে একটু বড় হইলে জয়া বলিয়া একজন সর্দ্দার ইহাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিল। অস্ত্রচালনা করিতে ইহার অল্প বয়স হইতে সাধ। জয়া একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়, কত স্থানে যে ডাকাতী করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই, সে শ্রীকে "ছোট মা" বলিয়া ডাকে ও বড় ভালবাসে, তাহার শিক্ষায় শ্রী এতদূর দক্ষতা লাভ করিয়াছে যে, জয়া মুক্তকণ্ঠে বলে, "আমার কোন শাক্‌রেদ ছোটমার নিকট দাঁড়াইতে পারিবে না।" সর্দ্দারের কথা কতদূর সত্য তাহার পরিচয় আপনি নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন।

এই প্রকারে সকলকার প্রিয়ভাজন হইয়া আমরা কোন মতে দিনপাত করি, এমন সময় আমাদের ঘরে এক দিন সিঁদচুরি হয়, চোরেরা যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিল, সর্ব্ব-স্বান্ত হইয়া ঘোর বিপদে পড়িলাম, কিছু না করিলে আর পেটচলিবে না, ভাবিয়া চিন্তিয়া একখানি নৌকা কিনিয়া খেয়া ঘাটে চালাইবার মানস করিলাম। ৬০ টাকা এ গ্রামের এক-

ভদ্রলোককে ধার দিয়াছিলাম, তাহা লইয়া নৌকা ক্রয় করিলাম ও খেয়ার কর্ম্ম করিতে লাগিলাম, আমি মালার ছেলে, বালককালে পিতার সঙ্গে জলে জলে বেড়াইয়াছি, সুতরাং জাতীয় ব্যবসায় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলাম। শ্রীও আমার সঙ্গে নৌকায় যাইতে লাগিল, এবং অল্পদিনের মধ্যে পাকা মাঝিগিরি করিতে শিখিল, এমন কি ঝড় তুফানের সময়ও ভ্রূক্ষেপ করিত না, অকুতোভয়ে নৌকা চালাইত, এক দিন নৌকা হইতে তীরে লাফাইয়া পড়িতে গিয়া আমি একটা গোঁজের উপর পড়িয়া যাই। বহু কষ্টে আরোগ্য হইলাম বটে, কিন্তু জন্মের মত খোঁড়া হইয়া যাইলাম। সেই পর্য্যন্ত শ্রী স্বয়ং পাটনির কার্য্য করে।”

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। শ্রীর ভোর বেলা উঠা অভ্যাস, শয্যা ত্যাগ করিয়াই গোপালের ঘরে আসিলেন, বৃদ্ধ হরিচরণ অমনি বলিয়া উঠিলেন “মা গো, একবার আয়, তোকে ভাল করে দেখি, প্রাণের জ্বালা ঘুচাই, তুই যে আমার ঔরসজাত মেয়ের অপেক্ষা অধিক।” শ্রী এই সমস্ত কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, এমন সময় গোপাল বলিয়া উঠিল “দিদি, ইহাঁকে প্রণাম কর, ইনি তোমার জেঠা মহাশয়—পিতার অগ্রজ, ভগবান আজ আমাদের শুভ মিলন করিয়া দিয়াছেন, ধন্য তাঁহার লীলা।” শ্রী বৃদ্ধের পদধূলি লইলেন, হরিচরণ পুনরায় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “মা আমিই তোমার হতভাগ্য জ্যেষ্ঠতাত, আমারই জন্য তোমার পিতা দেশত্যাগী,

আমাকে কি তুমি ভালবাসিতে পারিবে?" শ্রীও চক্ষের জল সামলাইতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "জেঠা মহাশয়, আমি অনাথিনী, পিতামাতা উভয়কে হারাইয়াছি, পথের ভিখারিণী হইয়াছি, আহা বলিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দেয়, এমন কেহ ছিল না, গোপাল দাদা না থাকিলে হয়ত এতদিন প্রাণে বাঁচিতাম না, তা ভগবান যে আমার দারুণ কষ্টের সময় আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন, ইহা আমি বহুভাগ্য বলিয়া মানি, আপনার চরণতলে মাতাপিতৃ বিয়োগ-জনিত দুঃখ ভুলিতে পারিব, ইহার অপেক্ষা অধিক আনন্দকর আর কি হইতে পারে?" হরিচরণ শ্রীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার জেঠিমা ও ভাই ভগ্নী দুটিকে লইয়া আসি। আজ আমরা এখানে থাকিব, এই শুভমিলনের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিব, কল্য এখানকার সব লেটা ফট্‌কা মিটাইয়া, তোমাকে ও গোপালকে লইয়া, সকলে মিলিয়া বাটীর জন্য রওনা হইব, এমন সুখকর দিন আমার ভাগ্যে ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। ধন্য দয়াময়! ধন্য তোমার লীলা!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চরণে সবার,
করি নমস্কার——বিদায় দাও আশীষ করে।

গ্রামে যখন রটিল যে শ্রীর জেঠা মহাশয় আসিয়াছেন এবং তিনি উহাঁকে লইয়া দেশে যাইবেন, তখন আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, ছোট, বড়, পণ্ডিত, মূর্খ যে যেখানে আছেন, সব দলে দলে, পালে পালে, আসিয়া শ্রীদের ভিটায় উপস্থিত। শ্রীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের সোপান হইয়াছে জানিয়া সকলেই এক বাক্যে সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রাম ত্যাগের কথায় সকলে প্রকৃতপক্ষে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীকে সকলেই ভালবাসে এবং গ্রামের শ্রী বলিয়া বিবেচনা করে। রামের মা বলিয়া উঠিল "ওমা, আমার দশা কি হবে, আমি যে প্রাতে তোর মুখ না দেখে হাটে জিনিষ বেচ্‌তে যাই না, যে দিন না তোর মুখ দেখি সে দিন আমার লোকসান হয়, একটা পয়সাও কাটে না।" বুড়ি দত্ত গিন্নি চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিল, "আমার সরোর কি হবে, সে যে তুমি না দাঁড়ালে ভাত খায় না, আর যা দুপাতা পড়িতে শিখিয়াছে, সে ত কেবল তোমার কৃপায়।" মুচিরাম ডোম বলিয়া উঠিল "মা, তুমি থাক্‌লে, আমাদের দুঃখীর বিপদে আপদে কে দেখিবে?" শ্রীর শিক্ষাদাতা কথক ঠাকুর ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন "মা, লক্ষ্মী আমার, তুমি যে আমা-

দের গ্রামের যথার্থই শ্রী, তা ভগবান করুন তোমার পূর্ণমাত্রায় মঙ্গল হউক, ভাল লোকের ঘরণী হও, তা মা, যতদিন বাঁচিব, তোমায় কায়মনে আশীর্ব্বাদ না করিয়া জল গ্রহণ করিব না।” বুড়া জয়া সর্দ্দারও নিরশ্রু নহে, সে বলিয়া উঠিল, “আমার গাঁয়ের শ্রী চলিল, মা রক্ষাকালী চলিল, মার কাছে কোন ব্যাটা আছে, যে অস্ত্র ধরে দাঁড়ায়।” শ্রীর সঙ্গিনীরা হাঁসিতে হাঁসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঠিক যেন রৌদ্রের সময় বৃষ্টি পড়ার মতন কত কথা বলিলেন, সকলেরই ধূয়া “আমাদের ভাই ভুলিস্‌নে, সর্ব্বদা খবর দিস্, তোর বিয়ের সময় আমরা যেন যেতে পাই।”

এই প্রকার সকলকার আশীর্ব্বাদ ও অনুরাগ কুড়াইয়া শ্রী গ্রাম ত্যাগ করিয়া ভাউলিয়ায় উঠিলেন, ঘাটে লোকে লোকারণ্য, যতক্ষণ ভাউলিয়া দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ তাহারা সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল, পরে দুঃখিতচিত্তে আস্তে আস্তে গৃহাভিমুখে গেল, ঘর কয়খানি যাইবার সময় শ্রী রঙ্গিণী বলিয়া পতিপুত্রবিহীনা এক স্ত্রীলোককে দান করিয়া গেলেন এবং গরু বাছুর তৈজসাদি নানা দ্রব্য, নানা লোককে বিতরণ করিয়া যাইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বহু আশ করি, এনু দেশে ফিরি,
মুছিতে নয়ন বারি,
বাদ সাধি বিধি, হরে নিল নিধি
অকূল পাথারে ডারি।

কোন আপদ বিপদ না ঘটিয়া, ভাউলিয়া ও আনুষঙ্গিক নৌকাগুলি নরহট্ট (আধুনিক কাঁচড়াপাড়া) গ্রামে গিয়া লাগিল, নরহট্ট গঙ্গার উপকূলে স্থিত এবং একখানি প্রকৃত বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম, এখানে অনেক সঙ্গতিপন্ন ভদ্র লোকের বাস এবং বৈদ্যকুলতিলক, মহাপ্রভু চৈতন্যের কৃপার পাত্র, কবি কর্ণপুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বহুপরে এখানে বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, এবং পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি প্রভৃতি অনেক মহাত্মা জন্ম-গ্রহণ করেন হরিচরণ বাবু গ্রামে আসাতে সকলেই আহ্লাদিত হইলেন, তিনি দেশে পোঁছিয়া ভগ্ন বসতবাটীর সংস্কার ও নূতন ইমারত নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্রই তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল, যেন বাটীতে কোন ক্রিয়া পড়িয়াছে, গ্রামস্থ ও গ্রামের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে লাগিলেন, ফলে হরিচরণ বাবুর আগমনে অনেক লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। শ্রী অল্প দিনের মধ্যে গ্রামের মেয়ে মহলে প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করিলেন, সকলে তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ভাল

বাসিতে লাগিল, শ্রী স্বার্থত্যাগ করিতে পারিত এবং পরের হিত করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত সে বড় মিষ্টি ও প্রিয়ভাষিনী সুতরাং সহজেই অপরের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত। শ্রীর বিবাহের জন্য হরিচরণকে সকলে অনুরোধ করিতে লাগিল, তাঁহারও এ কর্ম্ম সম্পন্ন করা নিতান্ত অভিপ্রেত, চারিদিকে পাত্রের অনুসন্ধানে ঘটক ছুটিল এবং নানা স্থানে এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। নরহট্ট গ্রামে অদ্যাবধি কৃষ্ণরায়জি ঠাকুর বিরাজ করিতেছেন, এমন সুন্দর, নয়নতৃপ্তিকর, সাম্যমূর্ত্তি বোধ হয় বঙ্গদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনী ৺ নিমাই-চরণ মল্লিক ইঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এমন রূপ ত দেখি নাই, ইনি যে ঠাকুরের ঠাকুর।" বিগ্রহ দেখিয়া নিমাই বাবুর ভক্তি স্রোত খুলিয়া যায় এবং তিনি কয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কৃষ্ণ রায়ের মন্দির, নাট-মন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত করান এবং সেবার জন্য জমিদারীও খরিদ করিয়া দেন। পূর্ব্বে মন্দিরাদি কিছুই ছিল না, সামান্য একটী ঘরে ঠাকুর থাকিতেন এবং ঘরটি গঙ্গার উপরে ছিল, নরহট্ট গ্রাম হইতে গঙ্গা এখন দূরে পড়িয়াছেন, প্রথমে ছোট চড়া পড়ে, সেই চড়া এখন এত বিস্তৃত হইয়াছে, যে গ্রাম হইতে গঙ্গার জল অন্ততঃ অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে স্থিত। যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে, তখন সুরধনী গ্রামের পাশ গিয়া ভীমরবে বহিতেন, কৃষ্ণরায়জির আরতী দর্শন করিতে সন্ধ্যার পর বিস্তর লোকের সমাগম হইত, ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা পদব্রজে দলে দলে আসিয়া "আরতি" দেখি-

তেন এবং অবশেষে মধুর হরি সঙ্কীর্ত্তণ শুনিতেন, রাত্র নয়টার পর সকলে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতেন। শ্রী বাটী আসিয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যহ রাত্রে বিগ্রহ দর্শনে যাইতেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম শুনিতেন, সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রী দেব দর্শনে যাইতেন, ভগবানে তাঁহার এই বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে কোন কারণে শ্রীমন্দিরে না যাইতে পারিলে শ্রী মর্ম্মাহত হইত। এক ফাল্গুনীয় শুক্লা চতুর্দ্দশাতে কৃষ্ণ রায়জির মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তণের বড় ধূম হয়, অনেক রাত্র পর্য্যন্ত হরিনাম হয়, শ্রী ভাবে এত মাতোয়ারা হন যে এত অধিক রাত্র হইয়াছে, তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই, সঙ্কীর্ত্তণ ভাঙ্গিয়া যাইলে তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, হরিচরণ বাবুর বাটী গ্রামের উত্তরাংশে ছিল, মন্দিরটি দক্ষিণাংশে স্থিত; ব্যবধানের অংশটুকু কমবেশ প্রায় অর্দ্ধক্রোশ, গ্রামের ভিতর দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা আঁকা বাঁকা, সুতরাং অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়, গঙ্গার ধার দিয়া যে সরু পথ গিয়াছে, তাহা সোজা, শ্রী গঙ্গাতীরের পথ মনোনীত করিয়া উহাতে ধীরে ধীরে চলিলেন। সঙ্কীর্ত্তণের সেই সুন্দর সুললিত পদাবলি গুণ গুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিলেন, একে পল্লীগ্রাম, তাহাতে আবার অধিক রাত্র হইয়াছে, গঙ্গাতীরে জনমানবও নাই, ঝর ঝর করিয়া দক্ষিণ বাতাস বহিতেছে, চন্দ্রা-লোকে চতুর্দ্দিকে আলোকিত, গঙ্গাজলে রৌপ্যের ন্যায় চক্ চক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং সমুদ্রবক্ষে মিলিবার জন্য আনন্দে কুল কুল রবে ছুটিতেছে, নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষে

পাপিয়া স্বচ্ছ মুগ্ধকর আলোক পাইয়া মহা আনন্দে প্রিয়তমাকে ডাকিতেছে, ডাক ব্যোমাকাশে বিস্তৃত হইয়া দূরে লয় পাইতেছে; আর দূরে গঙ্গোপকূলে একটী চিতা জ্বলিতেছে, চিতালোক ক্ষণে উজ্জ্বল, ক্ষণে স্তিমিত হইতেছে, যাইতে যাইতে শ্রীর দৃষ্টি চিতার দিকে পড়িল, অমনি গান বন্ধ হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, মুখ ম্লান হইয়া আসিল, মাতার মৃত্যু মনে পড়িল, জীবের এই শেষ গতি দেখিয়া প্রাণ চঞ্চল হইল, একদৃষ্টে চিতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, মনে হইতে লাগিল যে এই নিশ্চেষ্ট শব, হয়ত একজন শূরবীর ছিল, কতই এ ভাল বাসিয়াছে, কত ভালবাসার লোককে ছাড়িয়া গিয়াছে, এখনই বা কোথা গিয়াছে, কি করিতেছে, শ্রী ভাবিল তাঁহার মাতাই বা কোথায়, ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে বাস করিতেছেন, মাতার সেই প্রেমমাখা, সরল মুখখানি মনে পড়িল, শ্রী চক্ষের জল ফেলিলেন, ক্রমে মোহ উপস্থিত হইল, দেখিলেন মা যেন সম্মুখে কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া আছেন, শ্রী শিহরিয়া উঠিলেন, চক্ষের পলক আর পড়িল না, স্থির দৃষ্টিতে, প্রস্তরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, শ্রী দেখিল সীতা ঠাকুরাণীর মুখ খানি গম্ভীর, যেন বিষাদে মাখা, শ্রী মনের আবেগে মাতাকে ধরিতে ছুটিলেন, দুই দশ পা গিয়াই, গঙ্গার পাহাড় হইতে জলে পড়িয়া গেলেন, চিত্তচাঞ্চল্যের জন্যে শ্রী এত দুর্ব্বলা হইয়াছেন, যে তাঁহাকে কেহ সহায়তা না করিলে হয় ত প্রাণে মারা যাইতেন, এক খানি ছোট নৌকা

কিনারে কিনারে আস্তে আস্তে লগী ঠেলিয়া শ্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, নৌকায় এক জন মাঝি, চারিটা দাঁড়ি ও দুই জন খুব বলবান্ লোক ছিল, শ্রী তীরে দাঁড়াইলে, নৌকা খানিও তীরে লাগান হইল, শ্রী সতর্ক কিম্বা সহজভাবে থাকিলে হয় ত সমস্ত দেখিতে পাইতেন, কিন্তু মোহ বশতঃ চিত্ত হারাইয়াছেন, কোন দিকেই লক্ষ্য নাই, কেবল অসত্য, কল্পনাজাত মাতৃমূর্ত্তির দিকেই তাঁহার মন, প্রাণ, দৃষ্টি পড়িয়াছে, সুতরাং কিছুই দেখিতে শুনিতে পাইলেন না, পাগলিনীর মতন দৌড়িলেন, অমনি পদস্খলিত হইয়া পড়িলেন, গঙ্গার স্রোতে, ঈদৃশ অবস্থায়, সহজেই ডুবিয়া যাইতেন, কিন্তু নৌকার লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নৌকায় তুলিয়া লইল, নৌকাও তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিয়া বলপূর্ব্বক দাঁড় টানিতে লাগিল, নৌকা তীরবৎ বেগে উত্তরাভিমুখে ছুটিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘোর নারকী,
কে এ পাতকী——কাহার হেন কাজ ?

হুগলীজেলায় রামতারক বসু বলিয়া একজন ধনাঢ্য যুবাপুরুষ ছিলেন, তিনি অল্প বয়সে, পিতৃবিয়োগবশতঃ, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন, যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে, বিস্তর অশিক্ষিত স্বার্থপর কুলোক, ইহাঁর পাল্লায় আসিয়া জুটিল এবং অল্প দিনের মধ্যে নানা তোষামোদ ও প্রলোভন দেখাইয়া এমন কুপথে লইয়া গেল, যে শীঘ্র তিনি একজন উচ্চ দরের লম্পট ও পানাসক্ত বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেন, যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার পৈশাচিক ব্যবহারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভদ্রবংশীয় কেহই, ইহাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না ও বাক্যালাপ করিবার উপায়ও ছিল না, একেত ভয়ানক দূষিত-চরিত্র তাহাতে আবার গোঁয়ার ও রাগী বলিয়া, কেহ ইহাঁর নিকটে যাইত না, সকলেই সাত হাত দূরে থাকিত, ইতর লোকেরাই ইহাঁর সহায় ও তাহাদের সঙ্গেই দিনপাত করিতেন। কতকগুলি কুস্তিগির পালোয়ান ও খেলোয়াড় লাঠিয়াল ইহাঁর নিকটে থাকিত এবং তাহাদিগে সঙ্গে না করিয়া, ইনি একপদও চলিতেন না, প্রতিবাসী গ্রামস্থ লোকেরা ইহাঁর জন্য শশব্যস্ত, ঝি বৌ লইয়া ঘর করা তাঁহাদের দায় হইয়া উঠিত, সুযোগ পাইলে ইনি

ছলে, বলে, কৌশলে কুলবালাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, নিকটে সুন্দরী স্ত্রীলোক না পাইলে, ইহাঁর যমকিঙ্কর সদৃশ অনুচরেরা দেশবিদেশেও সন্ধান করিয়া বেড়াইত, যেমন করিয়া হউক, স্ত্রীলোক ধরিয়া আনিয়া ইহাঁর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। এই নরপিশাচ একদিন মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া প্রধান সহ-চর ভজহরিকে ডাকিলেন এবং রোষকষায়িত-লোচনে বলিলেন—

"ওরে শালা ভজা, জুতিয়ে তোকে তাড়িয়ে দেব"

"হুজুর, মা বাপ, কসুর মাপ করুন"

"মাপ কর্‌বা কিরে শালা, আজ তিন দিন ধরে ফাঁকি দিচ্চ আর খালি বোল্‌চো নিয়ে এলুম বলে"

"হুজুর মনিব, অন্নদাতা, হুজুরকে কি ফাঁকি দিতে পারি? তা হলে যে আমার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িবে"

"ইস্‌, শালার কি ধর্ম্মজ্ঞান, শালা যেন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, এখন বল্‌ শালা, সে দিন আমার ২০০ টাকা নিয়ে কি ক'ল্লি?"

"হুজুর, ৬০ টাকা শ্যামী বষ্টমীকে দিয়াছি, সে নূতন মালের খবর এনে দেয়, আর বাকি টাকা লছ্‌মন সর্দ্দারকে দিয়াছি, সে মাল হুজুরে হাজির ক'রবে"

"লকা, কবে আস্‌বে বলে গেছে?"

"দু এক দিনের মধ্যে"

"তাকে, পাঠিয়েচিস্‌ কোথায়?"

"নরহট্টে"

"কিস্তি করে গেছে"

"আজ্ঞে হাঁ, পাঁচুর নৌকায়, আর তার সঙ্গে পতাও আছে"

"তা বেশ হয়েচে, এখন কাজ সিদ্ধি কর্‌তে পারবে ত?"

"আজ্ঞে, পারবেই পারবে, তাকে মত্‌লব সম্‌জে দিয়িচি, মেয়েটা রোজ কৃষ্ণ-রায়ের আলুতি দেখতে যায় আর প্রায়ই রাত্রে গঙ্গার পথে বাড়ি ফেরে, আমি বলে দিয়িচি তার পাছে পাছে ফিরবে, সুযোগ পেলে ধরে নৌকায় তুলবে"

"দেখতে্ কেমন?"

"পরির মতন"

"গোলমালের কোন ভয় নাইত?"

"তা কিছু নাই, কিন্তু মেয়েটা বাঘিনী, শুনেছি সব্ অস্ত্র খেলা জানে আর ডাকাত তাড়িয়েছে"

"বলিস্ কি?"

"আজ্ঞে হাঁ, তাই লকাকে বলে দিয়িচি, খুব সাবধানে কাজ করতে, মেয়েটা জান্‌তে পাল্লে, তাদের ধড়ে মাতা থাক্‌বে না।"

"এখন দেখ্, কি হয়; কোথায় নিয়ে যেতে বলেছিস্"

"গঙ্গার ধারের বাগান বাড়িতে"

"ভাল, ভাল, তুই শালা শাল না নিয়ে আর ছাড়্‌বিনা দেখ্‌চি"

"হুজুরের কৃপা, দাস চরণে পড়ে আছে"

বাবু এই কথাবার্ত্তার পর, টলিতে টলিতে কামরার

ভিতর চলিয়া গেলেন, আনন্দে পূর্ণমাত্রায় মধুপান করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই নরপিশাচের লোকেরাই সে রাত্রে শ্রীকে গঙ্গাবক্ষ হইতে উত্তোলন করিয়া নৌকায় স্থান দিয়াছে, শ্রীর মোহ হওয়াতে ইহাদের কার্য্য-সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হয় নাই, নচেৎ সে রাত্রে কি তুমুল ব্যাপার হইত, তাহা ভগবানই জানেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভুলিয়ে পাতিয়ে,
বলিয়ে ছলিয়ে——পাতিল বিষম ফাঁদ।

শ্রীর কোন বিশেষ আঘাত লাগে নাই, কিন্তু মন এত বিকল হইয়াছিল, যে নৌকার ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি দিশে হারার মতন, ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, প্রকৃত বিষয় এখনও উপলব্ধ করিতে পারেন নাই, একটা স্ত্রীলোক এক খানি শুষ্ক কাপড় পরাইয়া দিল, শ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কে গা?"

"মা, আমায় চেননা, আমার নাম শ্যামী, আমি তোমাদের আশ্রয়ে বাস করি, কর্ত্তা বাবু আমায় বড় অনুগ্রহ করেন"

"আমরা কোথায় যাচ্চি?"

কেন, বাড়ীতে, তোমার আসিতে রাত্রি হওয়ায় কর্ত্তাবাবু

আমাদের পাঠাইয়া দিলেন, আমরা ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিলাম, আর তুমি আসিয়া পৌঁছিলে, ভাগ্‌্গিস্ মা আমরা ছিলাম, তা না হলে আজ্ একটা ভয়ানক বিপদ ঘটিত, কৃষ্ণরায় রক্ষা করিয়াছেন।”

“হ্যাঁ, আমি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম, আঘাত লাগে নাই, কেবল রাত্রে অবগাহন স্নান হইয়াছে মাত্র।”

“মা, তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিলে, আমরা কোন্ মুখে বাটী যাইতাম।”

নৌকার প্রবেশপথে একটা পরদা ফেলা ছিল ও ভিতরেও কোন আলোক ছিল না, অন্ধকারে শ্রী তাঁহার সঙ্গিনীর মুখ দেখিতে পাইলেন না, দেখিলে তিনি চমকিত হইতেন, দেবপ্রতিম মনুষ্যের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মুখ যে এমন ভয়ানক হইতে পারে, ইহা বড় আশ্চর্য্য, মাগি দেখিতে কদর্য্য এবং তাহার মুখের ভাব ভয়াবহ—মাংসাশী পশুর শিকারের পূর্ব্বে যেমন মুখের ভাব ও দৃষ্টি হয়, ঠিক্ সেই মতন। শ্রীর তৃষ্ণা পাইল, তিনি একটু জলপান করিতে চাহিলেন, স্ত্রীলোকটা বাহিরে আসিয়া নৌকার খোলের ভিতর হইতে একটা গেলাস বাহির করিয়া গঙ্গাজল তুলিল এবং তাহাতে কি একটু সাদা গুঁড়া মিশাইয়া দিল, শ্রীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করিয়া ফেলিলেন, মাগি একটি পান হাতে দিল, তাহাও মুখে ফেলিয়া দিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্রীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর এলাইয়া পড়িয়া আবল্যের মতন হইল, তিনি আর বসিতে পারিলেন না, একটা বালিশে মাথা দিয়া শয়ন

করিলেন, শীঘ্রই হতচেতন হইয়া পড়িলেন। নৌকাখানা ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গার ধারে একখানি বাগানে গিয়া লাগিল, উদ্যানে একখানি দ্বিতল বাটী ছিল, বাটীটি একেবারে গঙ্গার গর্ভে, জোয়ারের সময় গঙ্গার জল তাহার সোপানে গিয়া উঠিত, শ্রীকে ধরাধরি করিয়া ঐ বাটীর উপরের এক ঘরে, একখানি খাটের উপর শয়ন করাইয়া, দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া দিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কে জানে তুমি কেমন ?
কে করে সে নিরূপণ ?
শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন,
দীন দয়াল নাম করে ঘোষণ।

ভোর বেলায় শ্যামী রামতারকের বাটি গিয়া উপস্থিত, রামতারক তখন শয্যা হইতে উঠেন নাই, পূর্ব্ব রাত্রে অধিক পরিমাণে মদ্যপান করাতে, তিনি এখনও উঠিতে পারেন নাই, ক্রমে বেলা অধিক হইল, শ্যামী আর চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, বৈঠকখানার ঘরে, যেখানে রামতারক শয়ন করিয়াছিলেন, সেই খানে গেল, "বাবু, বাবু" করিয়া ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না, তখন গাত্রে হাত দিয়া ঠেলিল, কোনরূপ সাড়া না পাইয়া, ঘরের

জানালা খুলিয়া দিল, সূর্য্যকিরণে ঘর আলোকিত হইল, তখন শ্যামী দেখে যে রামতারক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে, চারিদিক হইতে বিস্তর লোক ছুটিয়া আসিল, চিকিৎসক আসিয়া পৌঁছিলেন, ক্রমে প্রকাশ পাইল রামতারকের "এপোপ্লেক্‌সী" হইয়াছে, বাঁচিবার আশা খুব কম। ভগবান্ শ্রীকে রক্ষা করিলেন, তিনি এমনি করিয়াই যুগে যুগে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন, ধন্য অসুর-নিসূদন, কেশী-কংশ-নিপাতন মধুসূদন! ধন্য দয়াল হরি! জীবে কে তোমার লীলা বুঝিতে সক্ষম!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূমে লাথ মারে, কাঁপে থর থরে
গরজে হুঙ্কার ছাড়ে,
কাহার সাধ্য আটকে মোরে,
রোষে বামা বলে বারে বারে।

সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গিয়া, পরদিন বেলা দশটার পর শ্রীর চৈতন্য হইল, মাথা তখনও ঘুরিতেছে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণাও প্রবল হইয়াছে, কষ্টে পালঙ্ক হইতে উঠিয়া শ্রী ঘরের দ্বার খুলিতে গেলেন, দেখিলেন বহির্দ্দিক হইতে উহার তালা বন্ধ, হতাশ হইয়া পুনরায় খাটে আসিয়া বসিলেন, শরীর "ঝিম ঝিম" করিতে লাগিল, সুতরাং শয়ন করিতে বাধ্য হইলেন, শয়ন

করিয়া গত রাত্রের ঘটনাবলি ক্রমান্বয়ে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, সহসা সংলগ্ন মত কিছুই মনে পড়িল না, বহু চেষ্টার পর, সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল, তাঁহাকে যে দ্রব্যবিশেষ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে সন্দেহ হইল না, ভাবিলেন মনোবেগ বশতঃ শরীর কাহিল হইয়াছিল, তাই তিনি নৌকায় ঘুমিয়া পড়েন, কিন্তু সে স্ত্রীলোক ও অপরাপর লোকেরাই বা গেল কোথায়, কেন তিনি বাটী পৌঁছান নাই, আর কেমন করিয়া বা এ অজ্ঞাত বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন—এ সমস্ত ব্যাপার, তিনি কোনও মতে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন না, বাহির হইতে দরজায় কুলুপ দেওয়া দেখিয়া তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ হইল, ভাবিলেন কোন কু-অভিপ্রায়ে কি কেহ তাঁহাকে এ ঘরে আটক করিয়াছে, মনে ঘোর সন্দেহ ও তর্ক উপস্থিত হইল ; অমনি উঠিয়া পড়িলেন, যদিও তখনও কষ্ট ছিল ও বড় তুর্ব্বল হইয়াছিলেন তথাপি বিরক্তি প্রযুক্ত গর্জ্জিয়া উঠিলেন, শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিতে লাগিল, মুখ আরক্ত হইল, চক্ষু দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ক্রোধে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, শ্রী সগর্ব্বে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কি, আমায় ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে, এত বড় স্পর্দ্ধা ! দেখি, কে আমায় আটকায় ? আর কেবা আমার অনিষ্ট করিতে সক্ষম ও অগ্রসর হয় ?" শ্রীর চরিত্র যে ধাতুতে গঠিত, তাহাতে তিনি বিপদের সময় হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিবার বা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইবার লোক নহেন, ভয় বা বিপদের সময় তাঁহার সাহস, তেজ,

দৃঢ়তা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি পায়, ভগবানকে কায়মনে ডাকিয়া, শক্তিধরের নিকট বল ভিক্ষা চাহিয়া, তিনি ঘর হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, প্রথমে নিকটে কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য কিছু ডাকাডাকি করিলেন, কাহারও কোন উত্তর পাইলেন না, পাইবার উপায়ও ছিল না, কারণ বাগানে তৎকালে কেহই ছিল না, রামতারকের সাঙ্ঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া সকলেই তাহার বাটীর দিকে ছুটিয়া গিয়াছে, ঘরে কিছু খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় শ্যামা রাখিয়া গিয়াছিল, বাধ্য হইয়া শ্রী তাহা হইতে কিছু ভক্ষণ করিলেন, সামান্যরূপ খাইয়াও তাঁহার বলাধান হইল, তখন পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, একটা তাকের উপর একখানা কাটারী ছিল, শ্রী তদ্দ্বারা গঙ্গার দিকের একটা জানালার কাষ্ঠের গরাদে কাটিয়া ফেলিলেন, কাটিয়া তাহা বাহির করিয়া লইলেন, যে পথ হইল তাহার দ্বারা সহজে গলিয়া বাহির হওয়া যায়, বিছানার চাদর ছিঁড়িয়া পাকাইয়া দড়ি করিলেন, সেই দড়ি ও মশারির দড়ি একত্র করিয়া শক্ত করিয়া মোটা দড়ি পাকাইলেন এবং তাহা দৃঢ় করিয়া জানালায় বাঁধিলেন, দড়ি গাছটি একেবারে গঙ্গার জলে গিয়া পড়িল, তখন গরাদে স্থানান্তর করা পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্দ্দিকের কারনিশে গিয়া দাঁড়াইলেন, তৎপরে দড়ি ধরিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেলেন, কোমরে দা খানি তখনও পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা বাঁধা আছে, জলে নামিয়া গিয়া নিকটস্থ ঘাটে পূর্ব্ব রাত্রের নৌকা খানি বাঁধা আছে দেখিলেন, তখন কালবিলম্ব

না করিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলেন এবং তাহার বন্ধন খুলিয়া দিলেন, প্রবলবেগে দক্ষিণ বাতাস বহিতেছিল, শ্রী নৌকায় পাল তুলিয়া দিলেন এবং পালের রজ্জু ধরিয়া হালে গিয়া বসিলেন, নৌকা তীরের মতন ছুটিল, কোথায় যাইতেছেন, কোথায় গিয়া উঠিবেন, এ সব চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইল না, তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা—কেমন করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিবেন ? কেমন করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিবেন ?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিসের লাগিয়া, আমারে ত্যজিয়া
পলাল পরাণ পুতলি,
বল বল কোথা যাই,
কিসে তার দেখা পাই ?

শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দির হইতে রাত্রে বাটী না আসার দরুণ, হরিচরণ এবং তাঁহার বাটীর অপরাপর পরিজনেরা বড় ভাবিত হইয়া পড়িলেন, সকলে চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান লইতে বাহির হইলেন, গ্রামে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, ম্লানমুখে শশব্যস্তে সকলে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, শ্রী সাধারণের প্রিয়, সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থ যেন নিজ পরিবারের কাহাকেও হারাইয়াছে, এমত অনুভব করিতে লাগিলেন, আলো লইয়া নানা স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল, কোন ফলই ফলিল না, শ্রীকে পাওয়া গেল না। শ্রী যখন পাহাড়

হইতে গঙ্গাজলে পড়েন, তখন একজন চৌকিদার দূর হইতে তাহা দেখে, সে গাঁজা খাইয়া বিভোর হইয়া গীত গাহিতে গাহিতে গঙ্গার পথে যাইতেছিল, একটা স্ত্রীলোক পড়িয়া গেল দেখিল, কিন্তু সে কে বা কোথায় গেল তাহার অনুসন্ধান করিল না, আপন মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল, এবং সত্বরে তাহার রক্ষিতা এক ডোমনীর ঘরে গিয়া নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিল, পরদিন প্রাতে যখন শ্রীর অদৃশ্যের কথা লইয়া সর্ব্বত্র মহা আন্দোলন হইতেছিল, তখন এই মহাত্মা অম্লানবদনে বলিয়া উঠিল "আমি সব জানি, অধিকারী পাড়া হতে রোঁদ দিয়ে, গঙ্গার পথে, আমি যখন চৌধুরী পাড়ার দিকে যাচ্চি, তখন দেখি ছিরি ঠাক্‌রুণ গঙ্গায় ঝাঁপিয়া পড়্‌লেন, একখানা ছোট নৌকা যাচ্ছিল, তা থেকে একটা ছেলে জলে পড়ে, ছিরি ঠাক্‌রুণ তাই দেখে তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে নাপিয়ে পড়্‌লেন, আমি হাঁ হাঁ করে উঠলুম, কিন্তু তিনি কান দিলেন না, ছেলেটিকে ধরিলেন, সাঁতারে আসবেন, এমন সময় বান ডাকলো, সাড়াসাড়ির বান, তেজ দেখে কে ? নৌকাখানা, ছেলেটা, ছিরি ঠাক্‌রুণ যে কোথায় তলিয়ে গেলেন তার আর ঠিকানা কোত্তে পাল্লুম না, আমি গঙ্গার ধারে অনেক ক্ষণ ছুটোছুটী কোরে, শেষকালে রোঁদে চলে গেলুম," চন্দ্র চৌকিদারের কথা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, হরিচরণ এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, গ্রামের দুই দশ জন বিজ্ঞলোকে গঙ্গার দুই ধারে তল্লাস লইতে যুক্তি দিলেন, সেই মত করা হইল,

কিন্তু কোন উপকার দর্শিল না, শ্রীর আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, গোপাল উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতে ও বুক চাপড়াইতে লাগিল। মনুষ্য আশাতেই বাঁচিয়া থাকে, ভগ্নহৃদয় হইয়াও বুক বাঁধে, সুতরাং হরিচরণ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন না, অনুসন্ধান চলিতে লাগিল এবং তিনি সময়ে শ্রীর সম্বন্ধে শুভ সংবাদ পাইবার আশা হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

তরণী তরঙ্গে, চলিছে হে রঙ্গে,
মিলে দেখ কার সঙ্গে।

শ্রীর ছোট নৌকাখানি, দক্ষিণ বাতাসের জোরে পাল-ভরে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা অপ্রতিহত তীরবৎ বেগে বিশাল গঙ্গা-বক্ষে ছুটিতেছিল। পাছে শত্রুহস্তে পড়েন এই জন্য কোন স্থানে স্নান আহার কিম্বা বিশ্রামের জন্য লাগান হয় নাই, এত কষ্ট শ্রী মানসিক বলে সহজে সহ্য করিয়াছিলেন, কোনও মতে বিচলিত হন নাই, কিন্তু শ্রান্ত, কোমল শরীর আর কত ভার বহন করিবে? সেই রাত্রের ক্লেশের পর, শ্রী ৪৮ ঘণ্টা একাসনে, একভাবে বসিয়াছিলেন, কিন্তু এখন শরীর মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল, শ্রীর হস্ত হইতে হাল ও পালের দড়ি বিচ্যুত হইল, তিনি হালের নিকট উচ্চ স্থানে শয়ন করিয়া পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে

চক্ষু বুজিয়া আসিল, চৈতন্য-শূন্য হইয়া পড়িলেন। মাঝি অভাবে, নৌকা খানি, স্রোতের বেগে কিনারার দিকে আসিতে লাগিল, ক্রমে এক বাঁধা ঘাটে আসিয়া ঠেকিল, ঘাটের উপর এক বিগ্রহ-মন্দির, তাহার দ্বারে এক জটা-জূট-দণ্ডকৌপীনধারী, গলে রুদ্রাক্ষমালা-শোভিত সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি শ্রীকে ঈদৃশ অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং দ্রুতপদে গিয়া নৌকাখানি বাঁধিলেন, শ্রীকে অচৈতন্য দেখিয়া, তিনি ক্রোড়ে করিয়া মন্দিরের পার্শ্বের এক ঘরে, মৃগচর্ম্মোপরি শয়ন করাইয়া দিলেন এবং চৈতন্য সম্পাদনার্থে নিয়ম মত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টা সফল হইল, শ্রী চক্ষু উন্মীলন করিলেন, সন্ন্যাসী বিজ্ঞ, বহুদর্শী, তিনি সহজে বুঝিলেন স্ত্রীলোকটী অনাহার বশতঃ দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং সত্বর কিছু দুগ্ধ আনাইয়া পান করাইলেন, পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য বলকর আহার দিতে লাগিলেন, শক্তি-সঞ্চার বিদ্যাতেও তিনি পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ, শ্রী সেই জন্য অল্পকাল মধ্যেই বল পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, সন্ন্যাসীকে ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে নিবেদন করিলেন "পিতঃ! আপনার কৃপায় আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি এ কোন্ স্থান?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "এইটি মুঙ্গের সহরের কষ্টহারিণীর ঘাট, আর এইটি রঘুনাথজির মন্দির, তা মা, আজ্ তোমার অধিক কথাবার্ত্তা কহিবার প্রয়োজন নাই, তুমি বিশ্রাম কর, কল্য তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিব"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, এক বৃদ্ধা পশ্চিমা "দাই," শ্রীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিয়ে এ ধনী, কি জানি কি জানি,
শিহরে পরাণি, নাচিছে ধমনী।

সন্ন্যাসী নিজের ঘরে গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বারি-ধারা পড়িতে লাগিল, দুই কর যুক্ত করিয়া, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি ভগ্নস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হা, জগদীশ, আমার কি শেষে এই হইল ? এত কঠোরতার কি এই পরিণাম ? চিত্তকে জয় করিয়াছি বলিয়া আমার মনে অহঙ্কার হইয়াছিল, তাই বুঝি আমায় এই জ্বলন্ত পরীক্ষায় ফেলিয়া দিলে ? হে দর্পহারিন্, আমার চৈতন্য হইয়াছে, এখন কৃপা কর, ক্ষমা কর, কেন এ স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার মন টলিল ? কেন আমার ইহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইতেছে ? সন্তানকে দেখিলে যেমন মনপ্রাণ শীতল হয়, হৃদয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়, আমার ঠিক সেই মত হইতেছে, সংসার-ত্যাগী, বিবেকী সন্ন্যাসীর এ বিড়ম্বনা কেন ? ভগবন্ ! তুমি ছাড়া চিত্ত-সিংহাসনে আর কেহ বসিবে, আংশিক ভাবেও স্থান পাইবে, তাহা আমার সহ্য হইবেনা, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে আবার আবরণে ঢাকিব, আবার অমৃতে হলাহল, মিশাইব, ঠাকুর ! আমায় রক্ষা কর। যাহাকে আজও ভুলিতে পারি নাই—এ কন্যাটির সঙ্গে তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, সহসা যেন সেই

বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে ? সে যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে এত দিনে কোন ভাগ্যধরের ঘরণী হইয়া থাকিবে, তাহার এমন অসহায় অবস্থায় এখানে পোঁছিবার কোনমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাহাকে বালিকা অবস্থায় দেখিয়াছি, বড় হইয়া কেমন হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে যে সে একজন অতুলনীয়া সুন্দরী হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আহা! তাহার সেই কমনীয়া মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, অবয়বটি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার কত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন মতে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হই নাই, পূর্ব্ব স্মৃতির ন্যায় সেইটি সদা জাগিয়া উঠে, মনকে দোলায়, সাধন-ভজনের ব্যাঘাত করে, কত চেষ্টা করিয়া মনকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ করিতে হয়। গত পরশ্ব রাত্রে স্বপ্ন দেখি, যেন একজন স্ত্রীলোক আসিয়া আমার পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং নিতান্ত অনুনয় বিনয় করিয়া আমায় বলিতেছে, "রক্ষা কর"। তুমি কে? জিজ্ঞাসা করায় বলিল "হা আমার ভাগ্য, আমায় চিনিতে পারিতেছ না, আমি যে তোমার হতভাগিনী কন্যা"। অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; দেখি শেষ রাত্রি, শেষ রাত্রের স্বপ্ন সত্য হয় বলিয়া প্রবাদ আছে ; মনটা কিছু চঞ্চল হইল, তাহার পর এই স্ত্রীলোকটি আসিয়া পোঁছিল, ইহাকে দেখিয়াই আমার মন সিহরিয়া উঠিল, ভাবিলাম স্বপ্ন কি সত্য হইল। আর আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, স্বপ্নে যে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াছিলাম, তাহার চেহারা ও নবাগত স্ত্রীলোকটির চেহারা এক, কোন বিভি-

ম্নতা নাই। ইহার উপর আবার দর্শনমাত্র আমার মনে প্রেমের সঞ্চার হওয়া অধিক বিস্ময়কর। হে হরি! এই সমস্ত ভাবে হৃদয় মন্থন হইবার কারণ কি আমায় বলিয়া দাও, আমায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।” সন্ন্যাসী এই মত চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি কাটাইলেন, সে রজনীতে তাঁহার ভাল করিয়া আধ্যাত্মিক কর্ম্ম করা হইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হলো একি দায়,
কেন প্রাণ ধায়———তাঁর রাঙ্গা পায়?

রাত্রে “দাই” শ্রীকে সঙ্গে করিয়া এক ঘরে গিয়া শয়ন করিল; দাই শীঘ্রই ঘোর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, শ্রী কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমাইতে পারিলেন না. নানা চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিল। শ্রী ভাবিতেছেন— “আমার পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্মফল নিতান্ত মন্দ, নচেৎ শৈশবাবস্থা হইতে আমি কেন একাধারে কষ্ট পাই? অল্প বয়সে মাতৃধনে বঞ্চিত হই, তাহার পরেই পিতৃদেব ত্যাগ করিয়া যান, কষ্টে কালাতিপাত করি, এমন সময় জেঠা মহাশয়ের দর্শন পাইলাম, ভাবিলাম এবার বুঝি সু-বাতাস বহিবে. আশা দুরাশায় পরিণত হইল, কি বিপদেই পড়িলাম, মধুসূদন রক্ষা করিলেন, এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, কি ঘটনাচক্রে ঘরবাটী ত্যাগ হইল, ভগবন! অদৃষ্টে আর

অধিক কি আছে? এ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইতেছে, ইনি উচ্চদরের সাধক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইঁহার সঙ্গে কথা কহিতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, ইচ্ছা হয় ধর্ম্মচর্চ্চায় ইহার সঙ্গে চিরদিন কাটাই। ইনি কি আমায় চরণে স্থান দিবেন? এমন শুভদিন কি আমার আসিবে? কে বলিতে পারে? আর এক অদ্ভুত কথা, সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে যেন প্রেম উথলিয়া পড়িতেছে, পূর্ব্বে পিতৃদেবকে দেখিলে এই মত হইত। এ ভক্তিমিশ্রিত প্রেমের ভাব আর কাহাকে দেখিয়া কখন হয় নাই, ইনি কে? কোথায় বা ইহাঁর বাস ছিল? ইহাঁর কি ভালবাসার সামগ্রী কেহ ছিল? কে জানে?” এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে শ্রী অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরের রমণী,
বক্ষে লয় টানি—একি রীত,
বিপরীত।

শ্রী প্রাতঃকালে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া, ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিলেন, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! ভাল আছ ত? শরীরে কোন ক্লেশ নাই ত?” শ্রী উত্তর করিলেন, “পিতঃ, আপনার কৃপায় আমার সমস্ত মঙ্গল, ভগবান যখন আপনার নিকট পৌঁছিয়া দিয়া-

ছেন, তখন আমার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে, ইহা নিশ্চয়”

“মা! ভগবানে তোমার যখন এত বিশ্বাস, তখন সেই বলে তুমি সহজেই সর্ব্ব প্রকারে রক্ষিত হইবে”।

“তাহার আর কোন সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ যখন ভাগ্য ক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি, সাধু লোকে হরিকে সদা হৃদয়ে বহন করেন, সুতরাং তাঁহারাও শক্তিধরের শক্তির বিকাশ দেখাইতে সক্ষম”

“সে কথা সত্য, তা মা, তুমি এত অল্পবয়সে জ্ঞান, ভক্তির কুটিল তত্ত্ব জানিয়াছ, ইহা বড় বিচিত্র”।

“পিতঃ, আমি নানা স্থানে, নানা লোকের নিকট উপদেশ পাইয়াছি, কিন্তু তাহার অপেক্ষা এ সব তত্ত্ব স্বতঃই আমার মনে উদ্ভাসিত হয়”।

“মা! তোমার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হয় মাত্র, পূর্ব্ব জীবনে এ সব জ্ঞান তুমি আয়ত্ত করিয়াছিলে, ভক্তির পথেও অগ্রসর হইয়াছিলে, তাই এ সব কথা সহজেই তোমার মনে জাগে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন”

“গীতোক্ত কথাও আমি জানি, কিন্তু আপনার নিকট ধর্ম্মের সার মর্ম্ম জানিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে”।

“মা, সকল কার্য্যেরই একটা সুসময় আছে, জ্ঞানার্জ্জন পক্ষেও এই নিয়ম খাটে, আমি উপযুক্ত সময়ে এই বিষয়ে তোমার লালসা চরিতার্থ করিব, এখন তোমার

সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে উৎসুক হইয়াছি. সকল কথা আমাকে খুলিয়া ও বিস্তারিত করিয়া বল" ।

সন্ন্যাসী কর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া, শ্রী আপনার পূর্ব্বকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, কতক কথা বলা হইয়াছে মাত্র, এমন সময় সন্ন্যাসীর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, চক্ষু দিয়া অনবরত বারি ধারা পড়িতে লাগিল এবং মহা উত্তেজিত হইয়া শ্রীকে দুই হস্ত দিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং মুখচুম্বন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত, অনুচিত, অমানুষিক আচরণ কেন ? বলা বাহুল্য, যে এই সন্ন্যাসীই শ্রীর জন্মদাতা পিতা, ইনিই সংসারত্যাগী জীবনচন্দ্র ! ! কেমন আশ্চর্য্য ঘটনাচক্রে পিতা পুত্রীর মিলন হইল ; জগন্নাথের কাব্যময় লীলা কেমন বিচিত্র, কেমন মধুরতায় পূর্ণ, ধন্য তোমার নাম, ধন্য তোমার মহিমা ! !

———

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

একেতে মজিয়া, প্রেমেতে ভাসিয়া,
বিশ্বাস ধরিয়া, কামনা নাশিয়া
ভক্তিতে মাতিয়া, গৃহেতে বসিয়া———করনা ভজন,
পাইবে রতন।

পিতাকে পাইয়া শ্রীর মহা আনন্দ হইল, মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। সদা হরি কথা শুনিয়া মন বিভোর হইতে লাগিল। শরীর, মন, প্রাণের সকল জ্বালা মিটিল। শ্রী বাটী যাইতে আর চাহেন না; বলেন, "আমিও সাধন পথের পথিক হইব, মায়াময়, ক্লেশময় সংসারে আর ডুবিব না।" জীবন মহা বিপদে পড়িলেন, কন্যাকে কত বুঝাইলেন, বলিলেন "দেখ মা, জীবের সকল সংস্কার হওয়া কর্ত্তব্য, সংস্কার হইয়া যাইলে কামনা মিটে, ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত অধিক লড়াই করিতে হয় না, কামনা মিটিলে মন স্থির হয়, তখন ইহাকে সহজে হরির পদারবিন্দে সংলগ্ন করা যায়, বাসনাই জীবকে বদ্ধ করে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া, প্রেমভক্তিতে মাতিয়া, হরিধন পাইবার একান্ত আশা, একান্ত লালসাই মুক্তিপথে লইয়া যায়, তুমি এখন বালিকা, আকাঙ্ক্ষার কি দুর্দ্দমনীয় বেগ তাহা জান না, সংসারাশ্রমে কিছুদিন থাকিয়া সব রসাস্বাদন কর, যখন বুঝিবে এ সমস্ত অসার, অলীক, অসত্য, যখন ইহারা আর মুগ্ধ আকর্ষণ করিতে পারিবে না, যখন আত্ম সমর্পণ করিতে শিক্ষা করিবে, ঈশ্বর

ব্যতীত আর কিছুতেই সুখশান্তি পাইবে না, তখন গৃহ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত। মা! ঈশ্বর সর্ব্বত্রেই ওতপ্রতভাবে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বিকাশ মনুষ্য দেহে যেমন, তেমন আর কিছুতেই নহে। তুমি তোমার নিজের ঘটের অভ্যন্তরে দৃষ্টি কর, দেখিবে জগৎগুরু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন, অন্য দিকে দেখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা তোমাতে নাই, তাহা জগতে নাই, তুমি আর জগৎ এক উপকরণেই রচিত, একের দ্বারাই চালিত, একই জাগিতেছে, দুই নাই, দুই বলিয়া যাহা বোধ হয় তাহা সেই একেরই রূপান্তর। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্ত, জগতের উপকারার্থ—আবশ্যক মত, সাধকের ইচ্ছানুরূপ, তাঁহাকে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক সেই একই সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত এক ভাবেই চলিতেছেন, তাঁহার ভাব অচল, অটল, মনুষ্যের আবশ্যক মত পন্থাভেদ হইয়াছে মাত্র, তাঁহার বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি সেই একই, সেই এককে দর্শন স্পর্শন করা, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়া, নিষ্কাম প্রেমে আসক্ত হওয়া, তাঁহার সহিত আপনাকে একীকরণ করা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সকল সাধনের সার। তা মা, সদ্গুরু দীক্ষা শিক্ষা দিলে, গৃহ হইতেও সাধন করা যায়, তাই বলি তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, চল তোমায় আমি রাখিয়া আসি, আমি এ অবস্থায় তোমার ভার লইতে অক্ষম"। এত বুঝান সত্ত্বেও শ্রী পিতাকে ত্যাগ করিতে কিম্বা

পুনর্ব্বায় গৃহে যাইতে অনিচ্ছুক, জীবন স্বয়ং শ্রীর মন টলাইতে না পারিয়া, উহাঁকে তাঁহার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উজ্জল রতনে, দেখিনু নয়নে,
রাখিব যতনে, হেন সাধ মনে.
বিধাতা গোপনে, হরিল চেতনে,
ধরিব কেমনে, এ ছার পরাণে।

মুঙ্গেরের নিকট অনেক পাহাড় আছে, একটি পাহাড়ে প্রশস্ত একটি গুহা আছে, গুহাটি ছোট ঘরের মতন, প্রবেশের একটিমাত্র পথ আছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিলে গুহাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত, যদি ইহার পার্শ্বে একটি বড় "ফাটাল" না থাকিত, এই ফাটালের দরুণ গুহাদ্বার বন্ধ করিয়া দিলে, আলোকের অসদ্ভাব হইত না, ফাটালটি কম বা অধিক পরিমাণে আচ্ছাদন করিলে, সহজেই ইচ্ছামত আলোক পাওয়া যাইতে পারিত, গুহাটি স্বভাবজাত কিম্বা মনুষ্যকৃত, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন, কিন্তু সম্ভবতঃ স্বভাবের কার্য্যের উপর, মনুষ্যের হাতও ইহাতে আছে, গুহাটি পর্ব্বতের প্রায় শীর্ষ স্থানে স্থিত এবং ইহা হইতে দেশের চারিদিক উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গার দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর, রৌপ্যময় আঁকা-বাঁকা সর্পের ন্যায় স্রোতস্বিনী যেন নীরবে পড়িয়া আছেন, যেন কোন গতি

নাই, শ্যামল ক্ষেত্রগুলিও দেখিতে বেশ, মনুষ্য, পশু প্রভৃতিগুলি, ঠিক যেন পিতামহীর গল্পের "বিঘুতের" মতন, ফলে স্থানটি বড় মনোরম, নিকটেই একটি ঝরণা ঝুর ঝুর শব্দে পড়িতেছে, গুহার বাহিরে চারিদিকে নানাবিধ ফুলের গাছ, গাছে পক্ষিকুল সদাই কলরব করিতেছে, প্রকৃতিদেবী যেন এস্থানে হাসিতেছেন ও আপনার নয়ন মন মুগ্ধকর শোভা দেখাইতেছেন, এই শোভাই মনকে মাতাইয়া তোলে এবং সকল সৌন্দর্য্যের আকরের দিকে টানিয়া লয়, তাই সাধকেরা এই সব স্থানে থাকিতে ভালবাসেন। জীবন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া এই পর্ব্বতে উঠিলেন এবং গুহার দ্বারের নিকট গিয়া "গুরুদেব" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি বজ্রগম্ভীর স্বরে ভিতর হইতে উত্তর আসিল, গুহায় প্রবেশ করিবার আদেশ হইল, পিতাপুত্রীতে সভয়ে, ভক্তিভাবে প্রবেশ করিলেন। ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি একজন বিশালকায় পুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকের ঘন জটা ও মুখের গোঁপ, দাড়ি, দুধের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে, শরীর ক্ষীণ, কিন্তু প্রতিভাশালী, ললাট ও বক্ষঃ প্রশস্ত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে, কিন্তু সে জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, দেখিলে নিজের মস্তক যেন স্বতই হেঁট হইয়া আসে, কিন্তু বিশ্বাস হয়, যে আশীর্ব্বাদ ও শুভ কামনা ব্যতীত ইহা বুঝি অন্য কার্য্যে লাগে না, ইহাঁর বর্ণও উজ্জ্বল, গৌর, মহাত্মার সকল চিহ্নই ইহাঁর অঙ্গে লক্ষিত হয়, ফলে ইনি একজন প্রকৃত মহাপুরুষ, এই মহাপুরুষেরা জগৎ হইতে দূরে থাকিয়া মনুষ্যের কি হিতসাধন করেন,

তাহা সকলে জানে না, যদি জানিত, তবে ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাবান দেবতাবিশেষ ত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহাঁদেরই পূজা করিত, ইহাঁরা ভগবানের প্রকৃত দোসর—স্থিতি কার্য্যের সহায়কারী, যিনি এই উচ্চাসনস্থিত কোন মহাত্মার কৃপার পাত্র হইয়াছেন, তিনিই হরি চরণে স্থান পাইয়াছেন। জীবন ও শ্রী মহাভক্তিভাবে ইহাঁর চরণ বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, মহাপুরুষ কোন প্রকারে জিজ্ঞাসিত না হইয়া সহাস্যে বলিলেন "কি বাবা, মেয়েটি পিতাকে ছাড়িতে চাহে না, না ছাড়িবারই ত কথা, পিতৃপ্রেম উহাকে আকর্ষণ করিতেছে, না, পূর্ব্ব সংস্কার টানিতেছে, পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মফলের বেগ অনিবার্য্য, উহাকে সংসারী করিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, যে তোমার কন্যা সাধন পথে উচ্চ স্থান গ্রহণ করিবে, তা, এইমত ঘটিলে ত বড় ভাগ্যের কথা, যদি বংশধর একজন ঈশ্বর প্রেমে প্রেমিক হয়, তাহা হইলে পিতৃপুরুষেরা বাহু তুলিয়া নৃত্য করেন. তা বাবা. উহার শুভ ইচ্ছার ব্যাঘাত দিও না"। মহাপুরুষের কথা সমাপ্ত হইলে জীবন গলায় বস্ত্র দিয়া যুক্তকরে, বলিয়া উঠিল "ঠাকুর, আমি কিছু জানিনা, বুঝিনা, আপনি যেমত আজ্ঞা করিবেন, সেইমত করিব, আপনার উপদেশ পাইবার জন্যই, উহাকে এখানে আনিয়াছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা, আপনি অধম সন্তানের উপর কৃপা করিয়া একবার সেই "চক্রের ক্রিয়াটি" সম্পাদন করেন"। জীবনের গুরুদেব "আচ্ছা, তাহাই হউক" বলিয়া গুহার দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন, দ্বার রুদ্ধ হইলে,

একটি কৌটার ভিতর হইতে কিছু কাল দ্রব্যবিশেষের গুঁড়া বাহির করিলেন, তাহা দ্বারা মেঝের উপর একটি গোলাকার রাশিচক্র অঙ্কিত হইল, দ্বাদশ রাশি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল, এবং এক একটির উপর এক একটি তাম্রের ঘৃত-প্রদীপ রক্ষিত হইল, দীপগুলি জ্বালিয়া দিয়া, শ্রীকে চক্রের ভিতরে উত্তরাস্য হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং একটি মৃৎপাত্রস্থিত জ্বলন্ত অগ্নিতে ক্রমান্বয়ে গন্ধবিশেষ প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন, গুহাটি ধূমাচ্ছন্ন হইল এবং সৎগন্ধে আমোদিত হইল, সহসা শ্রীকে সম্মুখে দেখিতে বলিলেন, শ্রী একটা উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পাইলেন। সেটা কি, তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না, কিন্তু সেই উজ্জ্বল পদার্থে তাঁহার নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিলেন, যে বেশে যেমন করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাইলেন, ক্রমে এ প্রতিরূপ অন্তর্হিত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে শ্রী এক গৈরিক-বসনা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; বিশেষ লক্ষ্য করায় জানিতে পারিলেন যে ঐ ভৈরবী তিনি নিজেই এবং আরও দেখিলেন যে কতকগুলি নর নারী তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছে, দেখিতে দেখিতে এ সমস্ত তিরোহিত হইল, কেবলমাত্র একটা উৎকট জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল, জ্যোতিঃ দেখিতে শ্রীর চক্ষু যেন ঝল্‌সাইয়া আসিল, আপনা আপনি নিমীলিত হইয়া আসিল। দূরাগত, মধুর, মুগ্ধকারী সঙ্গীত তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; আনন্দে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল, কোথা হইতে আবল্য আসিল, ক্রমে নিদ্রা-

কর্ষণের ন্যায় হইয়া তিনি ভূতলশায়িনী হইলেন, যেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। মহাপুরুষ আস্তে আস্তে জীবনকে কি বলিয়া গুহা হইতে চলিয়া গেলেন, শ্রীর যখন চৈতন্য হইল. তখন তিনি দেখিলেন, গুহায় কেহ নাই, আর কিছু নাই, তিনি কেবল পিতার কোলে মস্তক দিয়া শয়ন করিয়া আছেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

স্মরি হরি, ত্বরা করি,
ধীরি ধীরি, চড় তরী——যাব জনম ভূমে।

পরদিন প্রাতে জীবন শ্রীকে বলিলেন "মা! গুরুদেব একবার আমাকে জন্মভূমি দেখিয়া আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই জন্য কল্যই আমি দেশাভিমুখী হইব, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে ত ?"

শ্রী উত্তর করিলেন "অবশ্য যাইব, কিন্তু আপনাকে আমায় কাশীধামের "আনন্দাশ্রম" রাখিয়া আসিতে হইবে, ভাগ্যবলে আমি আপনার গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়াছি—অভিনব দেহ পাইয়াছি, মন প্রাণ আনন্দে নাচিতেছে, এখন ইচ্ছা একবার সাধন করিব, আমি জানিতাম না, বীজ পড়িলে নেশা হয়, মানুষকে পাগল করে, অন্য সময় হইলে বাটী যাইবার নামে আমার কতই উল্লাস হইত, কিন্তু এখন আসল কার্য্য ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে সময় নষ্ট করিতে, আমার আদৌ স্পৃহা হইতেছে না, তা চলুন

একবার সব্ দেখিয়া আসি, জন্মের মতন বিদায় হইয়া আসি, শ্রী নাম ঘুচাইয়া জয়শ্রী হই, গুরুদেব আমাকে জয়শ্রী নাম দিয়াছেন, এখন হইতে আমি এই নামেই পরিচিত হইব"।

"মা! তুমি যথার্থ জয়শ্রী হও, নামের সার্থকতা কর, এই আমার একান্ত প্রার্থনা, ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, এই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ! তুমি রমণীকুলের উজ্জ্বল রত্ন—আদর্শ স্থল, ভরসা করি, কেহ না কেহ যেন তোমার পদের অনুসরণ করেন—তুচ্ছ ধ্বংসাপেক্ষ স্বামী ত্যাগ করিয়া, জগৎ-স্বামীতে মন, প্রাণ সমর্পণ করেন, পার্থিব স্বামী, জগৎ-স্বামীকে পাইবার সোপান মাত্র, তা যে ভাগ্যবতী, সুকর্ম্মফল সূত্রে, খদ্যোত ছাড়িয়া, একেবারে চাঁদ ধরিতে সক্ষম হন, তিনি ধন্য! তাঁহারই জীবন সার্থক!"

"পিতঃ, অপনাকে ও গুরুদেবকে পাইয়া আমার মনের অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে, এখন গুরুকরণের উপযোগিতা উপলব্ধ করিতে পারিয়াছি, জগৎগুরু আমার নিকট, ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার নিকট যাইতে পারিলে পথ প্রদর্শকের আবশ্যক হয় না, তাহা জানি, কিন্তু সে ব্যাকুলতা কোথায়? কে বা এমন ভাগ্যধর যে এ ব্যাকুলতা সহজে তাহার নিকট আসে? সুতরাং একজন স্পর্শমণির আবশ্যক, যিনি পরম ধন হৃদয়ে সদা জাগরিত করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎ-গুরুর পাদপদ্ম হইতে পড়িয়া, গঙ্গা পতিতপাবনী হইয়াছেন, যে মহাত্মা সেই পতিতপাবনকে সদা সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন

করিতেছেন, তিনি যে লৌহকে সুবর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? তাঁহারা জীবকে যে নূতন করিয়া গঠন করেন, তাহাব আর সন্দেহ নাই, দ্বিজ না হইলে—দুই বার জন্মিতে না পারিলে, হরিকে পাওয়া অসম্ভব।”

“মা! দেশভেদে কালভেদে পিতার অনন্ত নাম হইয়াছে, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অনন্ত পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু সকল নামই একের উদ্দেশে এবং সকল পথই এক স্থানে পোঁছিয়া দেয়, চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবাক্য মনে রাখিবে, নামে রুচি ও জীবে দয়া করিবে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে, অমানীকে মান দান করিবে এবং সদা হরি সঙ্কীর্ত্তন করিবে, সকল ধর্ম্মের সার কথা এই কয় বাক্যে নিহিত, আর সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে।”

“পিতঃ! যোগযুক্ত থাকা কি প্রকার আমাকে বুঝাইয়া দিউন।”

“মা! যোগযুক্ত থাকার অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আপনার অস্তিত্ব অহং জ্ঞান লোপ করিয়া—হরির চরণ ধরা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেমরূপিনী শ্রীরাধা, সহস্র ছিদ্র কলসে বারি আনিতে অনুজ্ঞাত হইয়া, যখন মনে প্রাণে—একতানে—ভগবানকে স্তব করিয়া চিত্তহারা হইয়াছিলেন, তখনই তিনি যোগযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার সত্ত্বগুণ পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইয়াছিল, তখন তাঁহার আধার আধেয় জ্ঞান রহিত হইয়াছিল, এই উৎকৃষ্ট ভাবকেই যথার্থ যোগ কহে”।

“আমি ত কাশীতে যাইব, সেখানে আমায় কে জ্ঞান শিক্ষা দিবে?”

"মা! শিক্ষা দিবার অনেক লোক আছে, গুরুকে ধরিয়া বসিয়া থাকিলে জ্ঞান স্বতঃই হৃদয়ে জাগে, তিনি এত দয়াল যে, আমাদের যেটী নিতান্ত জানা আবশ্যক, তাহা তিনি কাহারও না কাহারও মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেন, আর মা জ্ঞান অপেক্ষা, সরল সহজ বিশ্বাস ভক্তি ও প্রেমে, তাঁহাকে শীঘ্র ধরিতে পারিবে, তিনি বিশ্বাসীর নিকটে, নচেৎ বহু-দূরে; তিনি ভক্তের আয়ত্তাধীন, নচেৎ কে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে? এবং তিনি প্রেমিকের নিকট বিক্রীত, নচেৎ কে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে সক্ষম? কথায় বলে "ভক্তের হাতে ডুরি, আমায় যেদিকে ফিরায় সে দিকে ফিরি"।

"পিতা! আমার পিপাসা মিটিতেছে না, ইচ্ছা তোমার সুধাময় বাক্য শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই, আমায় যে আর কিছু ভাল লাগে না"।

"মা! ভাঁটা পড়িয়াছে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, চল, আমরা শীঘ্র নৌকায় গিয়া উঠি, পথে কথা কহিবার অনেক অবকাশ পাইব"।

এই বলিয়া পিতাপুত্রীতে তখনই নৌকায় গিয়া বসি-লেন, মাঝি হাল ধরিল, দাঁড়িরা সবেগে দাঁড় টানিতে লাগিল, নৌকা নরহট্টগ্রামাভিমুখে চলিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাঁদাতে সকলে,
কেন পুন এলে ?

যথা সময়ে নৌকা নরহট্ট গ্রামে গিয়া পৌঁছিল. জীবন ও শ্রীর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, গ্রাম ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের বাটী আসিয়া উপস্থিত. লোক সমাগমের বিরাম নাই, অনবরত আসিতেছে ও যাইতেছে, হরিচরণের বাটীতে আজ যে ভিড়, বোধ হয় বারওয়ারি তলায়ও তাহা হয় না, স্ত্রীলোক, পুরুষ, ছোট, বড়—সকলেই আসিতেছেন, সকলেই ইহাঁদের দেখিয়া মহা আনন্দিত হইতেছেন, নিজে হরিচরণও মহা সুখী হইয়াছেন, এ মিলন তাঁহার পক্ষে অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ; মৃত মনুষ্য যদি কোন রকমে প্রত্যাগমন করিতে পারেন এবং এইরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটিলে জীবিত পরিবারবর্গের যেরূপ আনন্দ উপভোগ হইবার সম্ভাবনা, হরিচরণের আজ সেই মত আনন্দ হইতে লাগিল, তিনি ভাবেন নাই যে ইহ-জীবনে আর ইহাদের কাহার সহিত তাঁহার পুনরায় দেখা হইবে, সুতরাং তিনি আজ আহ্লাদে বিভোর। গোপালও যে বিশেষ সুখী হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য, সে জীবনের পদযুগল ও শ্রীর হস্ত ধরিয়া অজস্র নয়নাশ্রু ফেলিতে লাগিল। লোক সমাগম ও গণ্ডগোল কিছু দিন পরে মিটিয়া যাইলে, হরিচরণ জীবনের নিকট শ্রীর বিবাহের কথা তুলিলেন, জীবন শ্রী সম্বন্ধে কোন কথাই এত দিন বড় ভাইকে বলেন নাই, এখন সুবিধা পাইয়া তিনি সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং জানাইলেন যে তাঁহারা উভয়ে শেষ

বিদায় লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। এই হৃদয়ভেদী কথা শুনিয়া হরিচরণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল, তিনি শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে, গৃহে রাখিবার জন্য, অনেক বুঝাইলেন, অনেক কাঁদাকাটা করিলেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না, অবশেষে হতাশ হইয়া তিনি কষ্টে নিতান্ত বিচলিত হইলেন, গ্রামে এ কথা সত্বর প্রচার হইল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলেই সমূহ বিষাদিত হইলেন, কিন্তু কোন উপায়ান্তর নাই, শীঘ্রই পিতাপুত্রীতে সকলের নিকট বিদায় লইলেন এবং বাটীর ও গ্রামের লোককে কাঁদাইয়া, দেশত্যাগ করিয়া যাইলেন, হরিচরণ শোকে শয্যাগত হইলেন এবং গোপাল, বালকের ন্যায় "আছড়া পিছড়ি" করিতে লাগিল, বাটীর অপর পরিজনেরা ক্রন্দনের রোল তুলিল, গ্রামের কেহই নিরশ্রু রহিলেন না, অন্য সময় হইলে, শ্রী এই দৃশ্য দেখিয়া, অবশ্য বিচলিত হইতেন, হয় ত নিবৃত্ত হইতেন, কিন্তু এখন তাঁহার হৃদয়ে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, কাহার সাধ্য তাহা নির্ব্বাপিত করে ? এ আগুণে শত সহস্র বিঘ্ন বাধা সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, সকল বন্ধন ঘুচাইয়া দেয়, আর একভাবে, এক পথে লইয়া যায়, অন্য দিকে দৃষ্টি করিতে দেয় না, কবে এ আগুন তুমি আমি হৃদয়ে জ্বালিয়া জীবন পবিত্র ও সার্থক করিব ?

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ

করিয়ে সাধনা,

পূরিল বাসনা,

ঘুচিল যাতনা,

জয়শ্রী বলনা——সকলে।

দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, মহাপুরুষের বাক্য সফল হইয়াছে, শ্রী যথার্থই আজ মহাযোগিনী, কাশীধামে মাতা জয়শ্রীকে কে না জানে এবং কে না প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভক্তি করে? আনন্দাশ্রম দিবারাত্র ভক্ত সাধকবৃন্দে পরিপূর্ণ, সকলকারই আকাঙ্ক্ষা মাতাজির সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার পদরেণু মস্তকে ধারণ করেন, অন্নদান, ভক্তিদান, জ্ঞানদান—সকল দানেই মাতা মুক্তহস্তা, মাতার দৃষ্টি পড়িলেই ঐহিক পারত্রিক সকল দুঃখ নষ্ট হয়, এই লোকের বিশ্বাস, সুতরাং অনেকেই বলিয়া থাকেন মা অন্নপূর্ণা জীবের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত কাশীতে জয়শ্রীরূপে দেখা দিয়াছেন, জয় মা জয়শ্রী! পাঠক! আপনিও কি আমাদের সঙ্গে একবার জয় মা জয়শ্রী বলিবেন না? জয়শ্রীর পিতা সন্ন্যাসী জীবন হিমালয়ের কোন পাহাড়ে যোগারূঢ় হইয়া আছেন, সে পাহাড়ে মনুষ্য সমাগম নাই, কেবল মাত্র এই পরম যোগী, ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, বাহ্য সজ্ঞা চৈতন্য নাই, পাষাণের ন্যায় অচল, অটল হইয়া অনন্ত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন, ধন্য জীবন, ধন্য তোমার জীবন!!

———

সম্পূর্ণ।